৭ম সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১৬–ফেব্রুয়ারি ২০১৭

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে শাসকগোষ্ঠীর গোয়েবলসীয় অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস

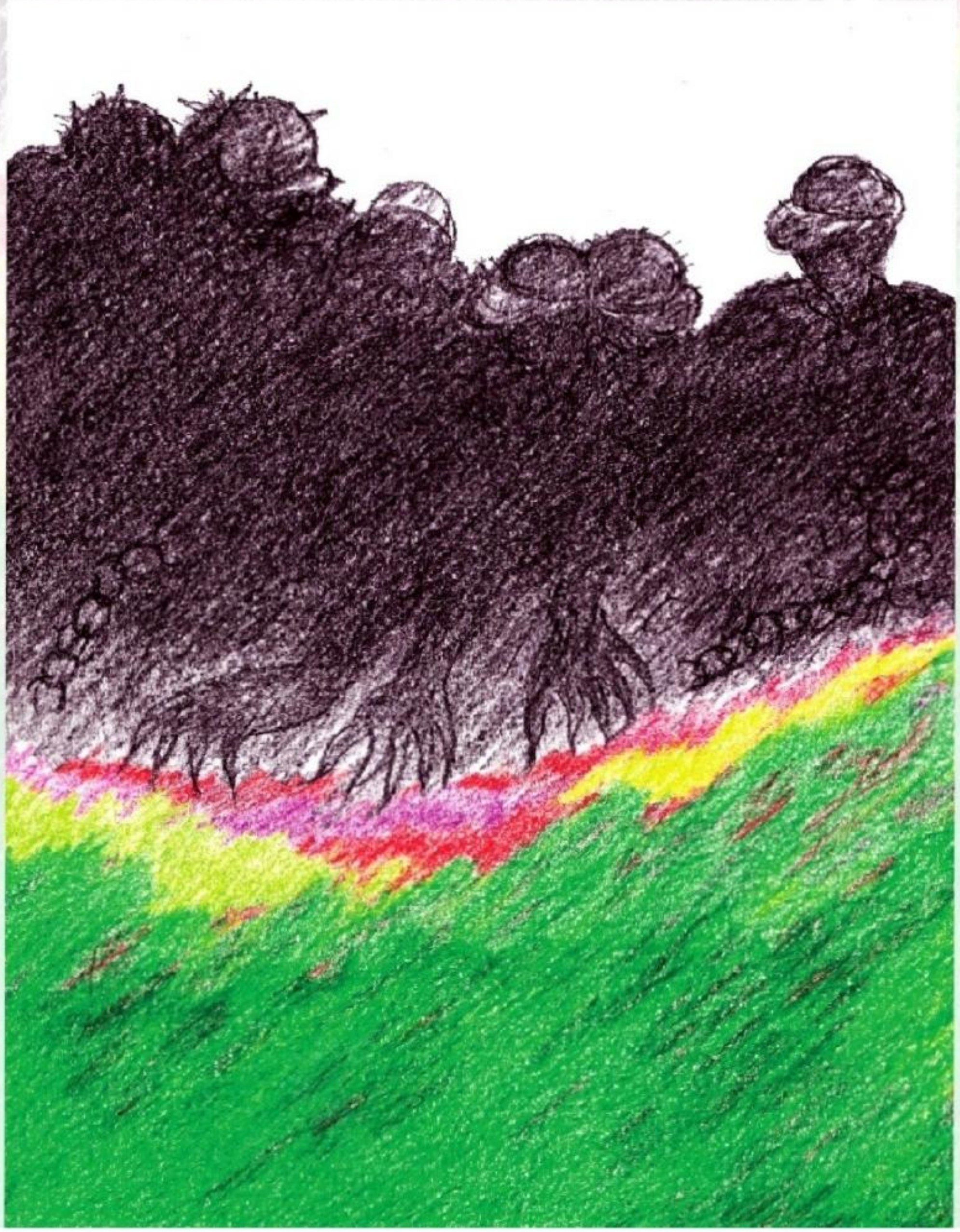

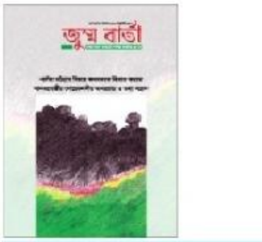

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ :

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে শাসকগোষ্ঠীর গোয়েবলসীয় অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস - মঙ্গল কুমার চাকমা/ ০৩ পৃষ্ঠা
- শাসক মহলের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা প্রসঙ্গে-সজীব চাকমা/ ১২ পৃষ্ঠা

বিশেষ প্রতিবেদন:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রকৃত বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকার সক্রিয় রয়েছে অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে/ ১৮ পৃষ্ঠা
- গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত/ ২১ পৃষ্ঠা
- ক্ষোভ ও প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯ তম বর্ষপূর্তি পালিত/ ২৩ পৃষ্ঠা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন/ ২৯ পৃষ্ঠা
- ঠেগামুখ স্থলবন্দর নির্মাণে আঞ্চলিক পরিষদ বিরোধিতা করেছে/ ৩৪ পৃষ্ঠা
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধভাবে ভূষণছড়া ইউপির আ'লীগের প্রার্থীকে চেয়ারম্যান ঘোষণা/ ৩৬ পৃষ্ঠা
- রোয়াংছড়িতে এক অপহরণকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী ও জেএসএস সদস্যদের উপর সেনা-পুলিশের নিপীড়ন-নির্যাতন/ ৩৮ পৃষ্ঠা
- বান্দরবানে নির্বিচারে ও অবৈধভাবে খাল, ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে পাথর উত্তোলন/ ৪০ পৃষ্ঠা
- রাঙ্গামাটির হেচোরি এলাকার ২৭ জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ষড়যন্ত্র/ ৪১ পৃষ্ঠা

সংবাদ প্রবাহ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা/ ৪৩ পৃষ্ঠা
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল/ ৪৬ পৃষ্ঠা
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন/ ৪৯ পৃষ্ঠা
- সংগঠন সংবাদ/ ৫২ পৃষ্ঠা
- আন্তর্জাতিক সংবাদ/ ৬০ পৃষ্ঠা

স ম্পা দ কী য় ....-

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু করা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকারকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায় চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে গোয়েবলসীয় কায়দায় নিরবিচ্ছিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে। সেই সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত কর্মীদেরকে চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসি ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করেছে।

২০১৬ সালে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায় শ'খানেক নিরপরাধ জুম্মদেরকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে এবং নব্বই জনের অধিক লোককে আটক করে নির্যাতন করেছে। কেবল বান্দরবান জেলায় মংপু মারমা নামে জনৈক আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকে গত জুন মাসে কে বা কারা অপহরণের পর রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে উক্ত অপহরণের সাথে জড়িত করে জনসংহতি সমিতির ৩৮ জন সদস্যের বিরুদ্ধে এবং তৎপরবর্তী সময়ে চাঁদাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে জনসংহতি সমিতির প্রায় শ' খানেক সদস্যের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কমপক্ষে ৩০ জনকে গ্রেফতার ও দেড় শতাধিক লোককে এলাকাছাড়া করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, জুম্ম জনগোষ্ঠী, জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলন ও আন্দোলনরত সংগঠনগুলো সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক একতরফা, বিকৃত, খণ্ডিত, সাজানো ও কল্পিত অপপ্রচার জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে সংবাদ প্রকাশে বাধা-নিষেধ, অপপ্রচারণায় ভাড়াটে সাংবাদিক এবং ভূঁইফোড় স্থানীয় প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকা চালুকরণ, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ভিত্তিহীন ইতিহাস অবতারণা করে, সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ধোঁয়া তুলে ঘৃণ্য তথ্য সন্ত্রাসে এসব গোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠেছে যা জার্মান স্বৈরশাসক হিটলারের প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসকেও হার মানায়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রেও বরাবরের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে অসত্য বক্তব্য প্রদান করেছে।

এই অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও তথ্য সন্ত্রাসের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অধিকতর অবনতির দিকে যেমনি ধাবিত হচ্ছে তেমনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়ে ও অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আখেরে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল সাময়িক লাভবান ও পরিতৃপ্ত হলেও তারা দেশে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে চরম ক্ষতি করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নতুন করে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে শাসকগোষ্ঠীর গোয়েবলসীয় অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস

মঙ্গল কুমার চাকমা

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, জুম্ম জনগোষ্ঠী, জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলন ও আন্দোলনরত সংগঠনগুলো সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক একতরফা, বিকৃত, খণ্ডিত, সাজানো ও কল্পিত অপপ্রচার জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে সংবাদ প্রকাশে বাধা-নিষেধ, অপপ্রচারণায় ভাড়াটে সাংবাদিক এবং ভূঁইফোড় স্থানীয় প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকা চালুকরণ, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ভিত্তিহীন ইতিহাস অবতারণা করে, সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ধোঁয়া তুলে ঘৃণ্য তথ্য সন্ত্রাসে এসব গোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠেছে যা জার্মান স্বৈরশাসক হিটলারের প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসকেও হার মানায়।

এই অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের সর্বশেষ সাঁড়াশি উদ্যোগ হলো ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের শেষান্তে ও ২০১৭ সালের জানুয়ারির প্রথমার্ধে ইনকিলাব, মানবজমিন, জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ইত্যাদি জাতীয় দৈনিকসহ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ভূঁইফোড় প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধারাবাহিক সংবাদ প্রতিবেদন একযোগে প্রচার ও প্রকাশ করা। 'পাহাড়ে অশান্তির আগুন', 'পাহাড় থেকে আসা অত্যাধুনিক অস্ত্র জঙ্গিদের হাতে', 'শান্তির পাহাড়ে হঠাৎ লু হাওয়া, জুম্মল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্ন!', 'ভূমি কমিশন আইনে সংশোধনী নিয়ে উত্তপ্ত পার্বত্যাঞ্চল', 'ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে ৩ গ্রুপের ১৮শ' সন্ত্রাসী, চলছে নীরব চাঁদাবাজি, জিম্মি সাধারণ মানুষ', 'পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী ও বাঙালীদের ভেতর ক্রমেই অবিশ্বাস বাড়ছে' ইত্যাদি ভীতি সঞ্চারকারী শিরোনামে বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করে দেশবাসীকে আতঙ্কিত করে তুলছে এবং জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে উস্কে দিচ্ছে। পত্রিকায় এমনভাবে বলা হয়েছে 'পার্বত্য তিন জেলা যেন অন্য এক জগৎ'।

এই তথ্য সন্ত্রাস ও অপপ্রচারণায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একটি মহল, গোয়েন্দা সংস্থা, আমলাতন্ত্র, হলুদ সংবাদকর্মী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, তথাকথিত সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবী, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধীতাকারী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দল, কতিপয় জাতীয় রাজনৈতিক দল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কায়েমী স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন মহল সম্পৃক্ত রয়েছে। কতেক ক্ষেত্রে এসব পক্ষসমূহ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী মনে হলেও এই অপপ্রচারণা ও তথ্য সন্ত্রাসে তারা কার্যত একসূত্রে গাঁথা ও অদৃশ্য সূতায় আতাঁতবদ্ধ। বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারী তথাকথিত নাগরিক সংগঠন জাতীয় পর্যায়ে অহি-নকুল সম্পর্ক হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ও চুক্তি বিরোধী গোয়েবলসীয় অপপ্রচারণা ও তৎপরতায় এক কাতারে পরস্পর সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অপপ্রচারণা ও তথ্য সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হলো জুম্ম জনগণের চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যায্য আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা, চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করা, জুম্ম জনগণের উপর চলমান দমন-পীড়নকে ধামাচাপা দেয়া, সরকারের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমকে জায়েজ করা, এবং চূড়ান্তভাবে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী হিসেবে অপপ্রচার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের দীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। সুদীর্ঘ ১৯ বছরের মধ্যে চারটি রাজনৈতিক সরকার ও দুইটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার- মোট ছয়টি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলেও কোন সরকারই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৯ সাল থেকে আজ অবধি প্রায় ৮ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে উন্নয়নের নামে ও চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে জুম্ম জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ও চুক্তি-পরিপন্থী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে থাকে এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে দমন-পীড়নের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করে চলেছে।

দীর্ঘ ৮ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়, পক্ষান্তরে সরকারের চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রমের ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি জুম্ম জনগণের চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রতি সাধারণ মানুষ হয়েছে চরম অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ। সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬-এর সময় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা সেটা বুঝতে পেরে দলীয় নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস না করার কারণে দলীয় প্রতীক (নৌকা মার্কা) নিয়ে অনেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী ছিলেন না।

এই ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে তথা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে 'সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে' আওয়ামীলীগের অনেক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে না পারার ষড়যন্ত্রমূলক ও ভিত্তিহীন অজুহাত

তুলে ধরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অজুহাতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ গত ২৪ মার্চ ২০১৬ রাঙামাটি শহরে এক তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে। সেনাবাহিনী, বিজিবি, গোয়েন্দাবাহিনী, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন দল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতি ও অধিকার কর্মীদেরকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, অপহরণকারী, খুনী, ধর্ষণকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, চোরাকারবারী হিসেবে চিহ্নিত করতে গোয়েবলসীয় অপপ্রচার শুরু করে। ভাড়াটে, সাম্প্রদায়িক, সুযোগসন্ধানী ও হলুদ সংবাদকর্মীদের দিয়ে ইনকিলাব, মানবজমিন, জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ইত্যাদি জাতীয় দৈনিকসহ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ভুঁইফোড় প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও কল্পিত সংবাদ প্রচার করতে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'পাহাড়ে অশান্তির আগুন' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত জনৈক ফারুক হোসাইনের প্রতিবেদনে এমন ভীতি সঞ্চারকারী পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলা হয় যে, "আঞ্চলিক দলগুলোর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খুন, গুম, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানিসহ এমন কোন অপরাধ নেই যার সাথে তারা জড়িত নয়। ...ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরাও সেখানে পাহাড়ি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায়। বাদ পড়ছে না সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরাও।" এই সংবাদ যে কত অতিরঞ্জিত, বানোয়াট, কল্পনা প্রসূত তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভীতিকর পরিস্থিতি সাজাতে গিয়ে এবং জুম্মদের আন্দোলনরত সংগঠনগুলোকে বর্বর সন্ত্রাসী ও ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে অতিরঞ্জন করতে গিয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যদেরকেও অসহায় হিসেবে সংবাদে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এসব বাহিনীর জন্য অপমানজনকও বটে। বাহ্যত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারণা চালানো হলেও তার অন্তরালে মূল টার্গেট হলো আপামর দেশবাসীর কাছে জুম্ম জনগোষ্ঠীকে বর্বর, বন্য, অসভ্য, ভয়ংকর, উচ্ছৃঙ্খল হিসেবে উপস্থাপন করা এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনকে সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রম হিসেবে তুলে ধরা।

'পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা' নয়, নিরাপত্তা বাহিনীগুলোই ছড়াচ্ছে অশান্তির আগুন

"রাতের অন্ধকারে চিৎকার শুনলেই অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠেন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালিরা। কেউ বুঝি প্রাণ হারালো পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের হাতে। আবারও বুঝি ধর্ষণের শিকার হলো কোন নিরীহ নারী-শিশু। চাঁদা না দেয়ায় হয়তো পুড়ে গেল কোনো পরিবারের কপাল। ...মেয়েদের তুলে নিয়ে করা হচ্ছে ধর্ষণ" (পাহাড়ে অশান্তির আগুন, ইনকিলাব, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬) – গোয়েবলসীয় কায়দায় এভাবে অপপ্রচার চালানো হলেও প্রকৃত সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরঞ্চ সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও সেটেলার বাঙালিদের অত্যাচারে জুম্মদের জীবন চরমভাবে অতিষ্ঠ ও ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে পড়ছে। রাত-বিরাতে সেনা-বিজিবি-পুলিশ তল্লাসি অভিযানের নামে কখন কোন জুম্মকে তুলে নিয়ে যায় এবং মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করে পঙ্গু করে দেয় সেরূপ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় জুম্মদের দিনাতিপাত করতে হয়। নিজেদের বাস্তুভিটা, বাগান-বাগিচা, চাষাযোগ্য জমি কখন কোন মুহূর্তে সেটেলার বাঙালিরা বেদখল করে নেয় কিংবা রাতের আধারে কখন সেটেলারদের সারি সারি ঘর নির্মিত হয়ে যায় এমন শঙ্কার মধ্যে থাকতে হয় জুম্মদের। সারাক্ষণই আতঙ্কে থাকতে হয় কখন কোন মুহূর্তে সেটেলার বাঙালি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক কোন জুম্ম নারী, শিশু ও কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়। জুম্মদের উপর এই শ্বাসরুদ্ধকর অরাজক পরিস্থিতি চাপিয়ে দিয়েছে বা 'পাহাড়ে এই অশান্তির আগুন' ছড়িয়ে দিচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী, সরকারি প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা। এভাবে দেশের ৬১ জেলার বাইরে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদেরকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত ৪৬ বছর ধরে সেনাশাসন এবং শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়নের মধ্যে এক নিরাপত্তাহীন শ্বাসরুদ্ধকর জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পরিবর্তে জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে সাম্প্রদায়িক হামলা, আক্রমণ, ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে নির্বিচারে ধর-পাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ, জুম্মদের ঘরবাড়ি তল্লাসি ও ভাঙচুর ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। কেবল ২০১৬ সালে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায় শ' খানেক নিরপরাধ জুম্মদেরকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে, নব্বই জনের অধিক লোককে আটক করে নির্যাতন করেছে এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে কেবল বান্দরবান জেলায় প্রায় দেড় শতাধিক লোককে এলাকাছাড়া করেছে। সেনা ক্যাম্প থেকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়া হয় যে, সেনাশাসনের বিরুদ্ধে টু শব্দও করা যাবে না; করলেই নির্যাতন অবধারিত। এভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক অবাধ নিপীড়ন-নির্যাতন ও যত্রতত্র অবৈধ গ্রেফতারের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়া এবং জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হচ্ছে।

জুম্মল্যাণ্ড, পৃথক পতাকা, মুদ্রা ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে অপপ্রচার

জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনকে সন্ত্রাস হিসেবে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শেষ নেই, দেশে-বিদেশে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী আন্দোলন হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য তারা নানা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। দেশে-বিদেশে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে উস্কে

দেয়ার হীনলক্ষ্যে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলোর ষড়যন্ত্রে দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব তিমুরের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি খ্রীস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিহীন ও বানোয়াট প্রতিবেদন প্রচার করছে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলো। এই অপপ্রচারের অংশ হিসেবে দৈনিক মানবজমিনে 'পাহাড়ে সামরিক কাঠামো তৈরি করে সশস্ত্র সংগঠনের দাপট' শিরোনামে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ জনৈক কাজী সোহাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "তাদের রয়েছে নিজস্ব সেনাপ্রধান, আলাদা আলাদা কোম্পানী, ...কাঁধে চকচকে ভারি ও দামি অস্ত্র। এ রকম প্রায় ১৮শ' সদস্য রয়েছে পার্বত্য জেলাগুলোতে। তারা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণ পাওয়া দক্ষ ও ক্ষিপ্র। ...তাদের রয়েছে নিজস্ব পরিচয়পত্র, মুদ্রা ও পতাকা। পাহাড়ে জুম্মল্যাণ্ড ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠনকে টার্গেট করে নীরবে সশস্ত্র কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে এই সশস্ত্র সংগঠনগুলো।"

বাক্য গঠনে ও শব্দ চয়নে সামান্য হেরফের করে একই ধরনের সংবাদ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে 'শান্তির পাহাড়ে হঠাৎ লু হাওয়া, জুম্মল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্ন!' শিরোনামে, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে 'পাহাড়ে অশান্তির আগুন' শিরোনামে, ৪ জানুযারি ২০১৭ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে 'ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে ৩ গ্রুপের সন্ত্রাসী, চলছে নীরব চাঁদাবাজি, জিম্মি সাধারণ মানুষ' শিরোনামে, ১৭ জুলাই ২০১৬ আমাদের সময়.কম-এ 'পাহাড়ে নানা কৌশলে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বিচ্ছিন্নতাবাদ' শিরোনামে এবং 'বাংলাদেশ সামরিক প্রতিরক্ষা-বিএমডি' নামক ফেসবুক পেজ-সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। যদিও সংবাদের প্রারম্ভে 'পার্বত্য অঞ্চল থেকে ফিরে' বা 'রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে' উল্লেখ করা হলেও এ সকল সংবাদের একমাত্র সূত্র হচ্ছে 'গোয়েন্দা সংস্থা', 'আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী', 'নিরাপত্তা বাহিনী' ও 'স্থানীয় সূত্র'-এর প্রতিবেদন বা বয়ান। এসব সংবাদে খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল মজিদ, রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ সুপার সাঈদ তরিকুল, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ ওয়াহেদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরীর বরাত দিয়ে ইতর বিশেষ হেরফের করে একই বক্তব্য বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়। এ থেকে বুঝা যায়, এসব সংবাদগুলোর তথ্য একই উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচারের জন্য এসব সংবাদগুলো একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সত্তর-আশি-নব্বই দশকে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র আন্দোলন চললেও জনসংহতি সমিতি বা জুম্ম জনগণ কখনোই স্বাধীনতা দাবি করেনি বা স্বাধীনতার দাবি তুলে জুম্মল্যাণ্ড, জুম্মল্যাণ্ডের জন্য পতাকা ও মুদ্রা প্রচলন করেনি। বরঞ্চ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের আওতায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দাবি জানিয়েছিল। তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান রেখে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি-উত্তর সময়ে জুম্ম জনগণের আন্দোলনের মূল কর্মসূচি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। জুম্ম জনগণের কোন সংগঠন থেকে বা রাজনৈতিক দল থেকে কেউ পৃথক জুম্মল্যাণ্ড গঠন, পৃথক পতাকা ও মুদ্রা প্রচলনের কর্মসূচি তুলে ধরেনি। এ ধরনের গুজব ও ভিত্তিহীন অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক।

বলাবাহুল্য, বর্তমান অবাধ তথ্য প্রযুক্তি যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নামে-বেনামে নানা জনে সত্য-মিথ্যা নানা সংবাদ প্রচার করে থাকে, যেটা ফেসবুক কর্তৃপক্ষও স্বীকার করে তা মোকাবেলার জন্য নানা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে অতি উৎসাহী ব্যক্তি 'পৃথক জুম্মল্যাণ্ড গঠন, পৃথক পতাকা ও মুদ্রা প্রচলনের' মতো গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়াতে পারে তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'গোয়েন্দা সংস্থা', 'আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী', 'নিরাপত্তা বাহিনী'গুলো সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কেন এ ধরনের গুজবকে ভিত্তি করে অপপ্রচারে মরিয়া হয়ে উঠবে? বস্তুত তারা দেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি দোহাই দিলেও এধরনের গুজবকে ভিত্তি করে গোয়েন্দা প্রতিবেদন সরবরাহ পূর্বক সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশবাসীর কাছে জুম্ম জনগণকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা স্বাধীনতাপন্থী হিসেবে তুলে ধরে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উস্কে দেয়া; আরো যদি সংকীর্ণ অর্থে বলতে গেলে তাহলে বলতে হয় যে, জুম্মদের বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙালিদেরকে উত্তেজিত করে তোলা।

এভাবে আজ শাসকশ্রেণি তথা রাষ্টযন্ত্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও বাহিনীগুলো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর নাম ভাঙিয়ে কার্যত জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু রাষ্ট্রশক্তি তাদের হাতে রয়েছে, আইন-আদালত তাদের নিয়ন্ত্রণে, অধিকাংশ প্রচারমাধ্যম তাদের কাছে করতলগত, কাজেই তারা এই প্রচারযুদ্ধ একচেটিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এবং দেশবাসীকে একতরফা, বিকৃত, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো পৌঁছে দিয়ে চলেছে যা প্রত্যক্ষভাবে দেশের জঙ্গী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে পুরিপুষ্ট করে তুলছে। জুম্ম জনগণ যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেশের নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে এসব অপপ্রচার চালিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলো জুম্ম জনগণকে আরো দূরে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে চলেছে বলে বলা যেতে পারে।

এই অপপ্রচারে মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম ভিত্তি তৈরি করতে প্রায় সময়ই জুম্মল্যাণ্ডের পতাকা নিয়ে বা নানা ধরনের ভিত্তিহীন গুজবের খোঁজখবর ও তথ্য নিয়ে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীকে তৎপর হতে দেখা যায় যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ভীতিকরও বটে। এ থেকে এটা বললে অত্যুক্তি হওয়ার কথা নয় যে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিংবা জনমনে 'পৃথক জুম্মল্যাণ্ড গঠন, পৃথক পতাকা ও মুদ্রা প্রচলনের' মতো গুজবগুলো এসব 'গোয়েন্দা সংস্থা',

'আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী', 'নিরাপত্তা বাহিনী'গুলোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রকারান্তরে প্রচার করে যাচ্ছে। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাহাড়ির নামে বাঙালিদের বা বাঙালির নামে পাহাড়িদের যে ধরনের বেনামী একাউন্টের ছড়াছড়ি রয়েছে বলে অনুমান করা হয় তা থেকে এই সন্দেহ কখনোই উড়িয়ে দেয়া যায় না। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্যই হলো গুজব ছড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং তাতে এসব কায়েমী গোষ্ঠী কর্তৃক ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা।

অস্ত্র ভাণ্ডার ও সশস্ত্র গ্রুপ সম্পর্কে অপপ্রচার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল ও কর্মীদেরকে অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করতে শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে অত্যাধুনিক অস্ত্র ভাণ্ডার ও সশস্ত্র গ্রুপের সদস্যদের বিপুল সংখ্যা দেখিয়ে গোয়েবলসীয় অপপ্রচারে নেমেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ 'পাহাড়ে অশান্তির আগুন' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে বলা হয় যে, "পার্বত্য এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে সন্ত্রাসীরা। ...দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে নেই এমন অত্যাধুনিক মডেলে অস্ত্রও পাওয়া যাচ্ছে সন্ত্রাসীদের কাছে। ...শুধু রাঙামাটিতে অত্যাধুনিক অবৈধ অস্ত্র রয়েছে ৮শ' থেকে ৯শ' এবং খাগড়াছড়িতে এই সংখ্যা সাড়ে ৫শ' থেকে ৬শ'।" ৪ জানুয়ারি ২০১৭ 'ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে ৩ গ্রুপের ১৮শ' সন্ত্রাসী' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে বলা হয় যে, "এই তিন গ্রুপের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৮শ'। ...এর মধ্যে জেএসএস (সন্তু) গ্রুপের রয়েছে প্রায় ৯শ' জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী। তাদের অধীনে রয়েছে সামরিক কায়দায় ৬টি কোম্পানি। জেএসএস (সংস্কার) এর রয়েছে ২টি কোম্পানি। তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীর সংখ্যা প্রায় পৌনে ৩শ'। আর ইউপিডিএফ এর ৪টি কোম্পানির অধীনে রয়েছে প্রায় ৭শ' সশস্ত্র সদস্য।" দৈনিক ইনকিলাবের ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় বলা হয়, "পার্বত্য অঞ্চলে জেএসএস ও ইউপিডিএফের ১০ হাজারের বেশি সন্ত্রাসী সক্রিয় রয়েছে।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র গ্রুপের উপস্থিতি সম্পর্কে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ভাণ্ডার ও বিপুল সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা নিয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা বাস্তবতা ও প্রকৃত সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষ কিছু সশস্ত্র গ্রুপ বিদ্যমান থাকলেও গোয়েন্দা, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর বরাত দিয়ে উপরোল্লেখিত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত অস্ত্র ভাণ্ডারের পরিমাণ ও সশস্ত্র সদস্যদের সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই গৌণ। এই সশস্ত্র গ্রুপের গঠন ও উত্থানের পেছনেও রয়েছে শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্র ও মদদ। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে চুক্তি বিরোধী গ্রুপ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, কার মদদে ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিন এই চুক্তি বিরোধী গ্রুপের উত্থান ঘটেছিল। শাসকগোষ্ঠীর মদদ ছিল বলেই ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে চুক্তি বিরোধী পোষ্টার, প্লেকার্ড, ফেস্টুনের লম্বা বাঁশ ও লাঠি নিয়ে এই গ্যাং ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল। যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, বিদেশী কূটনীতিক ও উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামিক কর্মকর্তাদের স্বার্থে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, কয়েকটি নিরাপত্তা তল্লাসি পেরিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকতে হতো, আগাম তালিকাভুক্তি ব্যতীত কারোরই প্রবেশ করার সুযোগই ছিল না, সেখানে কিভাবে চুক্তি বিরোধী গ্যাং দলবদ্ধভাবে দৃশ্যমান বিপুল সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেছিল তা ভেবে দেখলেই বুঝা যায় সেখানে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসনসহ শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন মহল প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে জড়িত ছিল। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এই চুক্তি বিরোধীরা অস্ত্র সংগ্রহ করে অবাধে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে এবং নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ চুক্তি পক্ষীয় লোকজনের উপর সশস্ত্র হামলা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা ও অফিস-আদালতের সন্নিকটস্থ স্থানে একপ্রকার নিরাপত্তা দিয়ে তাদেরকে অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এই সশস্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র গ্রুপের তৎপরতা দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে বৈধতা দেয়া, অপরদিকে এই সশস্ত্র গ্রুপকে দিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা।

জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে সরকারকে বার বার বলা সত্ত্বেও এই চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। ফলে নিজেদের জীবন বাঁচাতে ও আত্মরক্ষার স্বার্থে কতিপয় ব্যক্তি চুক্তি বিরোধী গ্রুপের সশস্ত্র হামলা প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে তুলে। এসব সশস্ত্র গ্রুপগুলো চুক্তি বিরোধী গ্রুপের প্রতিপক্ষ বলেই তাদেরকে চুক্তি পক্ষীয় সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এসব গ্রুপগুলোকে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে অপপ্রচার চালানো হয়। বস্তুত জনসংহতি সমিতি এসব সশস্ত্র গ্রুপের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, জড়িত থাকার প্রশ্নই উঠে না। অপরদিকে তথাকথিত চুক্তি পক্ষীয় সাশস্ত্র গ্রুপের প্রতিরোধের ফলে একপর্যায়ে চুক্তি বিরোধী গ্রুপ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা মহল থেকে এই গ্রুপকে মদদ দিয়ে তাদেরকে আবার শক্তিশালী করা হয়। অন্য দিকে ২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে কার মদদে ও সমর্থনে জাতীয় পর্যায়ে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সংস্কারপন্থীদের উত্থান ঘটেছে তা এখানে না বলাই শ্রেয়। শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে; বলা যায় বর্তমান সময়ে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সুযোগে আরো জোরদার হয়েছে।

এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র গ্রুপের উত্থান ও তৎপরতার পেছনে মূখ্যত শাসক মহলই দায়ী বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে

পারে। অথচ আজ সেই শাসক মহল তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাবশালী গোষ্ঠী এই সশস্ত্র তৎপরতার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল ও কর্মীদেরকে জড়িত করে অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার ষড়যন্ত্র চালাতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। অনেকটা 'চোরের মায়ের বড় গলা' এর মতো।

উল্লেখ্য যে, এসব সশস্ত্র গ্রুপগুলো জুম্মদের মধ্যকার অন্তর্কোন্দলের ফলে সৃষ্টি এবং তাদের তৎপরতা মুখ্যত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বাধীন জুম্মল্যাণ্ড গঠনের কর্মসূচি তুলে ধরতে তাদেরকে কখনোই শোনা যায়নি। তবে এটা ঠিক যে, তাদের সেই অন্তর্ঘাতি সশস্ত্র তৎপরতা পার্বত্যাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলার জন্য উদ্বেগজনক ও ক্ষতিকরও বটে। বলাবাহুল্য, পার্বত্যাঞ্চলের এই সশস্ত্র তৎপরতা মোকাবেলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে। পার্বত্য চট্টগ্রমের সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার জন্য চুক্তি বিরোধী গোষ্ঠীসমূহকে মদদ প্রদানসহ শাসকগোষ্ঠীর নানা মহলের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফলে জুম্ম জনগণের মধ্যে চরম হতাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জুম্ম জনগণের এই হতাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষকে পুঁজি করেই চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষ গ্রুপগুলো তাদের নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত করার ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জুম্ম জনগণের এই হতাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষকে দূরীভূত করতে হবে এবং তার মাধ্যমেই সশস্ত্র গ্রুপগুলোর তৎপরতাকে মোকাবেলা করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান যেমনি নিহিত রয়েছে তেমনি নিহিত রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র তৎপরতার অবসান। চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের সংঘাত দ্রুত নিরসন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চাঁদাবাজি বনাম দুর্নীতি ও টেণ্ডারবাজি

'তিন পার্বত্য জেলায় সশস্ত্র সংগঠনগুলোর চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ' এ ধরনের অপপ্রচারে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দল সরব রয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ দৈনিক মানবজমিনে 'পাহাড়ে সশস্ত্র সংগঠনের চাঁদাবাজির রাজত্ব' শীর্ষক সংবাদে "বছরে এ তিন জেলায় শুধু চাঁদা তোলা হয় ৪০ কোটি ২৯ লাখ ১৬ হাজার টাকা" বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত সংবাদে "বিভিন্ন খাত ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, জুম্ম জাতীয় নেতার মৃত্যু দিবস, মাতৃভাষা দিবস, দলের কাউন্সিল, বৈসাবি/বিজু/সাংগ্রাই, পূজা, বৌদ্ধ পুর্ণিমা, বৌদ্ধ বিহার/মন্দির, কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান ইত্যাদির নামে" নামে চাঁদাবাজি হয় বলে উল্লেখ করা হয়। চাঁদাবাজির পরিমাণ আরো অনেকগুণ বাড়িয়ে ১ জানুয়ারি ২০১৭ দৈনিক জনকণ্ঠে বলা হয় যে, "প্রতিদিনই পার্বত্য অঞ্চল থেকে সশস্ত্র উপজাতি গ্রুপগুলো এক থেকে দেড় কোটি টাকার চাঁদা আদায় করছে।" এটা বলার সুযোগ নেই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নানাভাবে চাঁদাবাজি হচ্ছে না। তবে যে হিসেবে চাঁদাবাজি নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দল অপপ্রচার চালাচ্ছে তা প্রকৃত পরিস্থিতির তুলনায় অতিরঞ্জিত। এই চাঁদাবাজির সাথে আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদেরকে জড়িত করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অপপ্রচার চালানোর পেছনে মূল উদ্দেশ্যই হলো জনসংহতি সমিতিসহ আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের উপর দমন-পীড়ন বৈধতা প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, '...বিজু/সাংগ্রাই, পূজা, বৌদ্ধ পুর্ণিমা, বৌদ্ধ বিহার/মন্দির, কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান ইত্যাদি' সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য জনগণের স্বেচ্ছায় দেয়া এককালীনও চাঁদাবাজি হিসেবে আখ্যায়িত করছে যার অন্যতম লক্ষ্য হলো জুম্মদেরকে এসব সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনেও বাধা সৃষ্টি করা। অথচ বিভিন্ন মসজিদ/মাদ্রাসার জন্য গাড়ি আটকিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মাইক বাজিয়ে রাস্তা-ঘাটে চাঁদা তোলা হলেও তা চাঁদাবাজি হিসেবে গণ্য করতে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী বা প্রশাসনকে দেখা যায়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দল চাঁদাবাজি নিয়ে সরব থাকলেও তিন পার্বত্য জেলায় সীমাহীন দুর্নীতি, প্রকল্প আত্মসাৎ, টেণ্ডারবাজি, দুর্বৃত্তায়ন ও দলীয়করণ সম্পর্কে একেবারেই নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিন পার্বত্য জেলায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে একটি পদের বিপরীতে ৫ থেকে ১২ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ সালে তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় হাজার খানেক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। প্রতিটি পদে গড়ে ৫ লক্ষ টাকা ধরলে এক হাজার পদের বরাতে ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে যা শাসকশ্রেণির সাথে যুক্ত লোকদের পকেটে চলে যায়। বর্তমান সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলায় অর্থের অভাবে খেটেখাওয়া গরীব মানুষের পক্ষে চাকরি পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বর্তমানে কনস্টেবল পদে নিয়োগ পেতে কমপক্ষে ৫/৬ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়। পুলিশ নিয়োগেও তিন পার্বত্য জেলায় কয়েক কোটি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। টেণ্ডারবাজি, প্রকল্প আত্মসাৎ, খাদ্যশস্য বাবদে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ও অনিয়ম তো রয়েছেই। আর রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম সম্পদ গাছ-বাঁশ পাচারে শতকোটি টাকার অনিয়ম ও লেনদেন। এই অনিয়মে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দল জড়িত বলে এ বিষয়ে তারা একেবারেই জেনেও না জানার ভান করে থাকে। আর চাকরির জন্য কেবল লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ দিলে হবে না, তজ্জন্য ক্ষমতাসীন দলের টিকিট বা সুপারিশ থাকতে হবে। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা অপব্যবহারের স্বর্গরাজ্যে ও দুর্নীতি আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। তথাকথিত উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজির কারণে নয়; শাসকশ্রেণির দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রকল্প আত্মসাৎ ও টেণ্ডারবাজিই হচ্ছে তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নে প্রধান বাধা, এটা নি:সন্দেহে বলা যায়।

অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী গ্রেফতার সম্পর্কে অপপ্রচার

বর্তমানে কতিপয় জাতীয় দৈনিকের পাতা খুললেই বা অনলাইন পত্রিকায় ঢু মারলে প্রায়ই বিপুল পরিমাণ 'অস্ত্র উদ্ধার' ও 'সন্ত্রাসী গ্রেফতার' এর খবর দেখতে পাওয়া যায়। অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেফতার পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন কোন ঘটনা নয়। এই অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী গ্রেফতারের সাথে জড়িত রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীসহ শাসক মহলের রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও কায়েমী স্বার্থ। একসময় বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়িকে বলা হতো অস্ত্রের খনি। কয়েকদিন পর পর সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হতো এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, এই অস্ত্র উদ্ধারে কেউ ধরা পড়তো না। বস্তুত অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্বদানকারী সংশ্লিষ্ট কম্যান্ডারদের প্রমোশন লাভ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তিশালী সশস্ত্র দল রয়েছে এই অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য নানা অভিনয়ের মাধ্যমে অস্ত্র উদ্ধার হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চে প্রকাশিত কবির হোসেন সিদ্দিকীর প্রতিবেদন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, "...কতিপয় বিডিআর কর্মকর্তার সাজানো নাটক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা প্রমোশন পাবার জন্যই একবার উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো বার বার করেই দেখানো হচ্ছে।" এটাই হচ্ছে তিন পার্বত্য জেলায় তথাকথিত অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেফতারের প্রকৃত ঘটনা।

> **"আমরা কোন সন্ত্রাসী নই, আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাদেরকে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকাতে আমরা এখানে এসেছি। আলোচনা সভা শেষে তার বাংলো থেকে বের হলে আর্মিরা গাড়িতে উঠতে বলে আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে এবং এখন সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।"**

পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র যে মোটেই উদ্ধার হয় না কিংবা অস্ত্রধারী কাউকে যে গ্রেফতার করা হয় না তা কিন্তু নয়। কিন্তু অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেফতারের ঘটনাগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ঘটনাই সাজানো ও পূর্ব পরিকল্পিত। যেমন গত ১৫ আগস্ট ২০১৫ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বড়াদমের বারিবিন্দু ঘাটে সংঘটিত সেনাবাহিনী ও অস্ত্রধারীদের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় ৫ জন অস্ত্রধারী নিহত এবং ৩টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ২টি চাইনিজ রাইফেল, একটি এসএমজি ও একটি পিস্টল উদ্ধারের ঘটনা সঠিক হলেও ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতারকৃত ৫ জন ব্যক্তি ছিল নিরীহ গ্রামবাসী।

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে বিজিতলা আর্মী ক্যাম্পের সেনারা খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়া গ্রামের কালিবন্ধু ত্রিপুরার বাড়ি থেকে অস্ত্রসহ তিনজনকে গ্রেফতারের ঘটনাও ছিল সাজানো ও পূর্ব পরিকল্পিত। জানা যায় যে, সেদিন গভীর রাতে কালিবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে ঘুম থেকে জাগিয়ে সবাইকে ঘরের বাইরে জড়ো করে। এ সময়ে সেনা সদস্যরা একটা হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে। ঘর থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে দু'টি পাইপ গান পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা করে। পরে সেনা সদস্যরা অস্ত্রগুলো গুজিয়ে দিয়ে তিনজনের ছবি তুলে তাদেরকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের অস্ত্রসহ তোলা ছবি ছাপিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে সংবাদ প্রচার করা হয়।

গত ১৪ জুলাই ২০১৬ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার তালুকদার পাড়ার ৬ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে ধরে এনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সন্ত্রাসী সাজানোর চেষ্টা করা হয়। সাংবাদিকদের সামনে তাদেরকে 'আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসী' বলে তুলে ধরলে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে লুসাইমং নামে একজন বলেন, "আমরা কোন সন্ত্রাসী নই, আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আমাদেরকে সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকাতে আমরা এখানে এসেছি। আলোচনা সভা শেষে তার বাংলো থেকে বের হলে আর্মিরা গাড়িতে উঠতে বলে আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে এবং এখন সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।" এই হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর সন্ত্রাসী গ্রেফতারের নমুনা। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনো ১০ হাজারের বেশি সন্ত্রাসী, কখনো ১৮শ' সন্ত্রাসীর সক্রিয় থাকার কথা প্রচার করা হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে তথাকথিত 'উপজাতীয়' অস্ত্রধারীদের কল্পিত রাজ্যে পরিণত করছে। সরকার নিজেদের স্বার্থে কখনো "পার্বত্য চট্টগ্রামে বয়ে চলে শান্তি সুবাতাস" (জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) বলে প্রচার করছে, পক্ষান্তরে আবার "অশান্তির আগুনে জ্বলছে পার্বত্য তিন জেলার মানুষ" (ইনকিলাব, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬) বলে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

পার্বত্য ভূমি কমিশন আইন সম্পর্কে অপপ্রচার

গত আগস্টে মন্ত্রীসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ অনুমোদনের পর সেটেলার বাঙালিদের পাঁচটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন উক্ত আইনের বিরোধিতা করে আসছে। "নতুন এ আইনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন এবং ভূমির অধিকার হারাবেন। ...এতে পাহাড়িদের আধিক্য থাকবে ও নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন" (বিবিসি ১০ আগস্ট ২০১৬; পার্বত্যনিউজ ১১ আগস্ট ২০১৬)। আর সে কারণে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী বাতিলের দাবি জানাচ্ছে এই পাঁচটি সেটেলার বাঙালি সংগঠন।

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ ফিরোজা বেগম চিনুও সেই অপপ্রচারে সামিল হয়েছেন। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ সিএইচটি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে

অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় "পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের ভূমি হারা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে" বলে খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেন যার মধ্য দিয়ে তাঁর সাম্প্রদায়িক চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

বস্তুত এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে ভূমি কমিশনকে বা পাহাড়ি সদস্যদেরকে নতুন কোন অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনে জুম্মদের সদস্য সংখ্যা যেমনি বৃদ্ধি করা হয়নি, তেমনি বাঙালিদের সদস্য সংখ্যাও কমানো হয়নি। কমিশনের চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা কমিয়ে ও কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অপর দুইজন সদস্যের পরিবর্তে অপর তিনজন করার ফলে অন্য কোন সদস্যের ক্ষমতাও বাড়ানো হয়নি। বরঞ্চ অধিকতর গণতান্ত্রিক ধারা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে এই ভূমি কমিশন আইনটি সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে এবং চুক্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বা এখতিয়ার ভূমি কমিশনের উপর ন্যস্ত করার বিধান যথাযথভাবে করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশোধিত ভূমি কমিশন আইনের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল, এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অনেক নেতা-কর্মীও অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে।

বাঙালিদের বিতাড়ন সম্পর্কে অপপ্রচার

বস্তুত 'পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবেন এবং ভূমির অধিকার হারাবেন' এমন আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক ও অবান্তর। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পাহাড়ি-বাঙালি যাদের জায়গা-জমি বন্দোবস্ত ও ভোগদখল রয়েছে তাদের অন্যায্যভাবে উচ্ছেদ হওয়ার বা ভূমি অধিকার হারাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতিকে লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে, জবরদস্তি উপায়ে কিংবা পদ্ধতি-বহির্ভুতভাবে জায়গা-জমি বন্দোবস্তী নিয়েছেন বা বেদখল করেছেন তাদের তো আইনের আওতায় আসতেই হবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে তো অবৈধ বন্দোবস্তী বা বেদখল ছেড়েই দিতে হবে। সেইসব অবৈধ দখলদারদের পক্ষে সাফাই গাওয়া কখনোই মানবিক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক হতে পারে না। বলাবাহুল্য, বাঙালিরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও ভূমি অধিকার হারাবার সস্তা শ্লোগান তুলে ধরে সাধারণ বাঙালিদের তথা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার যেভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে সেভাবে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও চুক্তির বিরুদ্ধে সেইরূপ অপপ্রচার চালিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অপপ্রচার

২০০৯ সালে পার্বত্য চুক্তি পক্ষীয় সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলেও আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা পূর্বক চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ও কার্যকরকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ও আইন পদক্ষেপ; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে 'চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে' বা 'চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক', '৮০% চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে', কখনো বা 'এ সরকারের আমলে ৯০% চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে' ইত্যাদি বুলি আওড়িয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 'চুক্তির ১৯ বছরের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বেশির ভাগ শর্তই পূরণ করা হয়েছে' (ইনকিলাব, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬) বলে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে অসত্য বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। বস্তুত ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে।

এ অপপ্রচারে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরো একধাপ গিয়ে চুক্তিরই বিরোধিতা করে চলছে এবং নানাভাবে অপপ্রচারে অবতীর্ণ রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ দৈনিক জনকণ্ঠ এবং ৪-৫ জানুয়ারি ২০১৭ দৈনিক ইত্তেফাকে খাগড়াছড়ির ডিসি মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানের দেয়া বক্তব্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "উপজাতিদের দাবি অনুযায়ী সব দফা বাস্তবায়ন করা হলে পার্বত্য অঞ্চল আর বাংলাদেশের অংশ থাকবে না। কারণ তখন তাদের হাতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও বন বিভাগ চলে যাবে। এখান থেকে সব নিরাপত্তা সংস্থার লোকজনকে চলে যেতে হবে। এসিল্যান্ড চলে যাবে। এসব যদি চলে যায় দেশের একদশমাংশের সার্বভৌমত্ব থাকবে না।" অপরদিকে 'সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা' শিরোনামে লেখা ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও গুইমারা রিজিয়নের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি-এর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "শান্তিচুক্তির কিছু ধারা আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক" ('দৈনিক পূর্বকোণ'-এর ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৫ এবং ১ আগস্ট ২০১৫; দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' ও 'যায় যায় দিন'

এর যথাক্রমে ৩১ জুলাই ২০১৫ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়েও প্রজাতন্ত্রের স্বাক্ষরিত চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা যে বক্তব্য দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায় সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে। খোদ সরকারি প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অর্গানই চুক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত অবস্থা স্বীকার করা নিঃসন্দেহে সততা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে কিংবা যা বাস্তবায়িত হয়নি তা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা নিঃসন্দেহে প্রতারণা এবং দূরভিসন্ধিমূলক বৈ কি। এটা চুক্তি বাস্তবায়ন না করারই একটা সুদূরী প্রসারী ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ক্ষমতাসীন দলসহ দেশের শাসকগোষ্ঠী চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না করার হীনউদ্দেশ্যেই চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়।

জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচিকে জুম্ম বিরোধী কর্মসূচিতে রূপান্তর

সারাদেশে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ তথা সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পার্বত্যাঞ্চলে সেই জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে ব্যবহার করা হচ্ছে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতি ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। তিন পার্বত্য জেলায় জঙ্গীবাদ বিরোধী সমাবেশে জঙ্গীদের পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করে থাকে। এমনকি "সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে জামায়াত-শিবিরের সাথে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সম্পর্ক ও সখ্যতা রয়েছে" (১৬ আগস্ট ২০১৬, দৈনিক পূর্বকোণ) মর্মে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট প্রচারণা চালাতে থাকে। "বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন ছাড়াও মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে" বলে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকারান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় জঙ্গীগোষ্ঠীগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ দৈনিক মানবজমিনে 'পাহাড় থেকে আসা অত্যাধুনিক অস্ত্র জঙ্গিদের হাতে' শীর্ষক সংবাদে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে বলা হয় যে, "স্থানীয় গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, পাহাড়িদের হাত ঘুরে এসব অস্ত্র এখন পৌঁছে যাচ্ছে দেশে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গিদের হাতে। ব্যবহার হচ্ছে দেশবিরোধী সন্ত্রাসী কাজে। আটক জঙ্গিরা পাহাড় থেকে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি এরই মধ্যে স্বীকার করেছে।" ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ জনকণ্ঠেও একই ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এযাবৎ শত শত জঙ্গী আটক করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি কোন জঙ্গী দাবি করেছে বলে শোনা যায়নি বা কোন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়নি। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত গোয়েন্দাদের সাজানো সংবাদ। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী জঙ্গীদের তৎপরতা আড়াল করে প্রকারান্তরে তাদেরকে মদদ প্রদান করা, পক্ষান্তরে জুম্মদের আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চালানোর অজুহাত তুলে ধরা।

আরো উল্লেখ্য যে, ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখের দৈনিক পূর্বকোণে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন থেকে জেএসএস অস্ত্র সংগ্রহ করছে বলা হলেও ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের দৈনিক মানবজমিনে 'পাহাড়িদের হাত ঘুরে এসব অস্ত্র এখন পৌঁছে যাচ্ছে দেশে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গিদের হাতে' বলে স্ববিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়। এ থেকে বুঝা যায়, জঙ্গীদের সাথে জেএসএসের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী ও ক্ষমতাসীনদের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও সাজানো।

গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, যুবসেনা ও ছাত্রসেনা নামক তিন জঙ্গী ও সাম্প্রদায়িক দল কর্তৃক পার্বত্য ভূমি কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করলেও প্রশাসন ও আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে সেসব চুক্তি বিরোধী ও জঙ্গী সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ তাদেরকে নির্বিঘ্নে কর্মসূচি পালনের সুযোগ করে দেয়া হয় বলে জানা যায়। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠীসমূহের তৎপরতা প্রকারান্তরে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

অপপ্রচারণায় ভাড়াটে সাংবাদিক, প্রিন্ট ও অনলাইন পত্রিকা

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রযুক্তির যুগে ভাড়াটে সাংবাদিক, হলুদ সংবাদ কর্মী, ভূঁইফোড় অনলাইন ও ছাপানো পত্রিকার মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীসহ শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন মহল। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাঙের ছাতার মতো অহরহ বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকা গড়ে তোলা হয়েছে। বাহ্যত ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এসব অনলাইন পত্রিকাগুলো গড়ে তোলা হলেও অধিকাংশই সরকারি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে। মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসার পাশাপাশি জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর প্রচারযুদ্ধে এসব অনলাইন পত্রিকাগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে চালু করা অধিকাংশ অনলাইন ও ছাপানো পত্রিকাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, জুম্ম জনগোষ্ঠী, জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলন ও আন্দোলনরত সংগঠন সম্পর্কে শাসকশ্রেণির একতরফা, বিকৃত, খণ্ডিত, সাজানো ও কল্পিত তথ্য ও সংবাদ অপপ্রচার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব পত্রিকায় সেনা কর্মকর্তা, সাম্প্রদায়িক লেখক ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লেখা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধী, জুম্ম বিদ্বেষী, আন্দোলনরত জুম্ম সংগঠন-বিরোধী লেখা ও প্রবন্ধ, সভা-সমিতিতে প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠন, নিরাপত্তাবাহিনী, ক্ষমতাসীন দল তথা শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্যগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি ইনকিলাব, মানবজমিন, জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ইত্যাদি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোও এসব অনলাইন পত্রিকায় পুনঃপ্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে গুইমারা ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও রিজিয়নের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তোফায়েল আহমেদ, মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান প্রমুখ সেনা কর্মকর্তাদের লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা ও সরকারি প্রকাশনায় প্রচার করা তার মধ্যে

অন্যতম। এই প্রচারণা শিল্পে এমন বৈষয়িক ও কায়েমী স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে যেখানে এককালে প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে যুক্ত অনেক ব্যক্তিও সরকারের বিশেষ মহলের অনুদানে অনলাইন পত্রিকা চালু করে এই জাতি-বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে সামিল হয়ে সুবিধবাদী ও সাম্প্রদায়িক ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অপপ্রচারের লক্ষ্যে সম্প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশেষ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে কিছু ভূঁইফোড় সাংবাদিক সৃষ্টি করে বিভিন্ন পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে দিয়ে থাকে বলে লক্ষ করা গেছে। সাংবাদিক সেজে সংবাদ সংগ্রহের নামে সহজে যাতে তারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রবেশ বা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তজ্জন্য উক্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী থেকে তাদের জন্য এ ধরনের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা বা সংবাদ মাধ্যম থেকে তারা বেতন-ভাতা না পেলেও সেই বিশেষ প্রভাবশালী গোষ্ঠী থেকে তাদেরকে নানাভাবে আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সেই ভূঁইফোড় সাংবাদিকদের দিয়ে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে বা জুম্মদের আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সংবাদ কিংবা সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেসব ভাড়াটে সাংবাদিকদের দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী অতিরঞ্জিত, বানোয়াট ও কল্পিত সংবাদ প্রচারের জন্য অপরাপর সাংবাদিকদের প্রভাবিত করা কিংবা জুম্মদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যমের স্থানীয় সাংবাদিকদের চাপ দেয়া হয়ে থাকে।

সংবাদ প্রকাশ, সভা-সমিতির উপর বাধা-নিষেধ

একদিকে অনলাইন ও ছাপানো পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অপপ্রচার জোরদার করা হয়েছে, অন্যদিকে জুম্মদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের সংবাদ এবং আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদের আহুত জনসভা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, নানা কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশের উপর শাসকশ্রেণির প্রভাবশালী মহল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে নিপীড়ন-নির্যাতন এবং আন্দোলনরত সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় না।

অন্যদিকে কতেক ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া হয় না আন্দোলনরত সংগঠনের জনসভা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভাবেশ, আন্দোলনের কর্মসূচি আয়োজন। গত ২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বান্দরবানের রাজার মাঠে নাগরিক সমাজের আহুত গণসমাবেশের অনুমতি প্রদান করেনি বান্দরবান জেলা প্রশাসন। গত ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৬ খাগড়াছড়ি জেলার সিন্দুকছড়ি সাব-জোনের সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টানানো পোস্টার ছেড়ে ফেলে এবং পোস্টারিং-এর কাজে নিয়োজিত কর্মীদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে আটকে রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ তিন পার্বত্য জেলার জেলায় গণমানববন্ধন আয়োজনে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে খাগড়াছড়ি সদরে মানববন্ধনে আসা লোকদের উপর পুলিশ চড়াও হয়। মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি ইউনিয়ন ও মহালছড়ি সদরে বাধা প্রদান করে। মহালছড়ি ক্যাম্পের সেনা কর্তৃক মাইসছড়ির ম্যাজিস্ট্রেট পাড়া ও নুনছড়ি পাড়ার মানববন্ধনে আসা লোকদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বেধড়ক মারধর করে। এতে ৯ জন আহত হয় এবং একজনকে ধরে নিয়ে থানায় কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। এভাবে আজ শাসকগোষ্ঠী মত প্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে অপপ্রচার

জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এক জাতির বিরুদ্ধে আরেক জাতিকে উস্কে দিতে অতি সুক্ষ্মভাবে অপপ্রচার চালানো হয়। ২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে 'পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী ও বাঙালীদের ভেতর ক্রমেই অবিশ্বাস বাড়ছে' শীর্ষক সংবাদে সুচতুরভাবে জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিভাজনের বিষ ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়। উক্ত সংবাদে বলা হয় যে, "পাহাড়ে ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ বাঙালী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমারা সংখ্যায় বেশি। সরকারের দেয়া সব সুযোগ সুবিধা এই তিন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষই ভোগ করছেন। বাকি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ দরিদ্র ও নিরীহ। ...তাদের মধ্যে পাহাড় স্বাধীন করার কোন চিন্তা কাজ করে না। তারা জানেনও না সরকার পাহাড়ীদের জন্য লেখাপড়া, সরকারি চাকরিসহ রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য শতকরা ৫ ভাগ কোটা রয়েছে। পাহাড়ে শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমারা। ...তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখোয়া, চাক খিয়াং, খুমি, লুসাই ও কোচদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। ...বাঙালীদের মতোই তাদের অবস্থান। তারা কখন চিন্তাও করে না পাহাড়ে কী ধরনের শাসন হবে।"

উক্ত সংবাদে সরকারি সুযোগ-সুবিধা কেবল চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা জনগোষ্ঠীর লোকেরাই ভোগ করছে কিংবা তারা ছাড়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে 'পাহাড় স্বাধীন করার কোন চিন্তা কাজ করে না' বলে উল্লেখ করার মাধ্যমে অতি সুক্ষ্মভাবে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এটা সত্য যে, চাকমাদের তুলনায় 'তঞ্চ্যঙ্গা, বম, পাঙ্খুয়া, চাক, খিয়াং, খুমি, লুসাইদের মধ্যে শিক্ষার হার কম'। কিন্তু 'শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমারা' এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও অপপ্রচারমূলক।

উপসংহার

উগ্র সাম্প্রদায়িক, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের পাশাপাশি নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে জুম্মদের মধ্যে একটি সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী শাসকশ্রেণির এই অপপ্রচারে চরম দালালি ভূমিকা পালন করছে। জুম্মদের জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

শাসক মহলের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা প্রসঙ্গে

সজীব চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইতিমধ্যে ১৯টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, খোদ ক্ষমতাসীন মহলের মধ্যে এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনের অভ্যন্তরে অনেককে চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। একদিকে দীর্ঘ বছর ধরে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে সেনা কর্তৃত্ব বিরাজ করছে, চলছে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদসহ ক্ষমতাসীন দলের সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ ও গণবিরোধী অপতৎপরতা এবং জুম্ম জনগণের উপর অব্যাহত শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করেছে। জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কথা ও কাজে অসঙ্গতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অদ্যাবধি সরকারের নীতিনির্ধারকরা 'চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক, এই সরকারের আমলেই চুক্তির পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হবে' ইত্যাদি বক্তব্য বা অঙ্গীকার ব্যক্ত করে চলেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার পক্ষ থেকে 'চুক্তির অধিকাংশ বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে', 'চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে' বলে দাবি করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য সরকারের এ দাবি মোটেও বাস্তবসম্মত ও সত্য নয়। যদিও গাণিতিক হিসাব দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থাকে তুলে ধরা বাস্তবসম্মত নয়, তথাপি জনসংহতি সমিতি তার প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে ৩৪টি ধারা এবং আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩টি ধারা।

চুক্তির বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়ন প্রশ্নে সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তার মাত্র দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো- চুক্তির 'ক' খন্ডের যে ৪টি ধারা রয়েছে সেগুলো 'সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে সরকার পক্ষ দাবি করেছেন। এই ৪টি ধারার মধ্যে ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা ও তা সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই বিধান অনুযায়ী, পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোন আইনী বা প্রশাসনিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে নানা কায়দায় একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে বহিরাগতদের অভিবাসন যেমনি ঘটছে, অপরদিকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে বসেছে। অপরদিকে ২নং ধারায় "যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে" মর্মে বিধান রয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য জাতীয় ও বিশেষ আইনগুলো এখনো অসংশোধিত অবস্থায় রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা) আইন, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধিবিধান ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি। সুতরাং এসব ধারাগুলো 'সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে দাবি করা কোনভাবে সঠিক হতে পারে না।

বস্তুত চুক্তি স্বাক্ষরের পর সুদীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও, এমনকি চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে সরকারের কোন আন্তরিক উদ্যোগ দেখা যায় না। চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের একটিও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা ভূমি সমস্যার একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি হয়নি; একজন আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুও পুনর্বাসন করা হয়নি; দীর্ঘ ১৯ বছরেও আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি ও নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা যায়নি; সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া এবং এই লক্ষে সময়-সীমা নির্ধারণ করার বিধান থাকলেও এখনো তিন শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন প্রত্যাহার করা হয়নি; জেলা পরিষদে এখনও সকল বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি, যেগুলো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় চুক্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে হস্তান্তর ও কার্যকর করা হয়নি। বস্তুত চুক্তির অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়াদি জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদনার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। বস্তুত জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখাশোনা করার কথা পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু দু:খজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে হিসেবে পার্বত্যাঞ্চলের জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা পালন করার কথা, সে হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না।

বরঞ্চ প্রায় ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লংঘন করে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকগণের পাশাপাশি তিন সার্কেল চীফগণও চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন' মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই নির্দেশনা প্রত্যাহারের জন্য বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও তা এখনো পর্যন্ত জারি রয়েছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কেবল সার্কেল চীফরাই স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান রয়েছে।

২১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে 'পার্বত্য সন্ত্রাসকে মুসলিম বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের জঙ্গীবাদ হিসেবে চিহ্নিতকরণের অপচেষ্টা' বিষয়ক এক গোপনীয় সার্কুলার জারি করে সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতাকে আড়াল করা ও মদদ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে ২৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে "'উপজাতীয়' সম্প্রদায়গুলোকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার অপতৎপরতা প্রসঙ্গে" শীর্ষক সার্কুলার জারি করে জুম্ম বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। শেষোক্ত সার্কুলারে 'বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সংবাদ মাধ্যম, জাতিসংঘের আড়ালে থাকা খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহ এ সকল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তাদেরকে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়তায় অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে' বলে বানোয়াট, কল্পনাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'শান্তিচুক্তি পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভা'য় পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বলেছেন, "অধিকাংশ চুক্তি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হলেও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) স্বীকার করেন না। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার কারণে গত ২২ বছরেও তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।..." ইত্যাদি। উক্ত সভায় 'জেএসএস-এর কাছেও অবৈধ অস্ত্র রয়েছে' বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। এভাবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা চুক্তি বিরোধী এবং চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন মহলে বিদ্বেষমূলক ও নেতিবাচক বক্তব্য দিয়ে থাকেন যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার সপ্তদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'রেগেক্ষ্যাং' নামে একটি প্রকাশনা বের করে। প্রকাশনাটি সম্পাদনা করেছেন স্বয়ং মন্ত্রণায়লয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। বেশ কিছু স্বনামধন্য লেখকের লেখা রয়েছে। কিন্তু এরকম একটি প্রকাশনায় বিস্ময়করভাবে (নাকি উদ্দেশ্য-প্রণোতিভাবে) গুইমারা রিজিয়ানের কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি লিখিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি এবং উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতা' নিবন্ধটিও রয়েছে, যাতে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন, পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যা ও বাস্তবতা, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ইতিহাস, আন্দোলন ও অধিকার সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর, অসম্মানজনক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক মতামত ও বক্তব্য রয়েছে। যা জুম্ম জনগণের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে সৃষ্ট পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনায় এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর ও জুম্ম বিরোধী লেখা প্রকাশযোগ্য হতে পারে না।

এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায় যেখানে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিবাচকভাবে ভূমিকা পালনের পরিবর্তে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকায় থাকতে বেশি দেখা যায়। মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৯৫% জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। বলাবাহুল্য, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয় ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন যা বিধি-বহির্ভূত ও যুক্তিসঙ্গত নহে। এক ব্যক্তি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে উন্নয়নের নামে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের চুক্তি বিরোধী ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে ক্ষমতাসীন দলের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরা। আর শুরু থেকে এদের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর উশৈচিং, কল্পরঞ্জন চাকমা ও তাদের সুবিধাভোগী পাহাড়ি-বাঙালি সাঙ্গপাঙ্গরা। শুরু থেকে তাদের তৎপরতা দেখা যায় চুক্তির স্বাক্ষরের ফলে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান, উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদসমূহে তাদের আসীন হওয়ার দালালীপনা ও অপতৎপরতা, আর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে নিজেদের আজ্ঞাবহ অনুসারীদের পুনর্বাসনের হীন ষড়যন্ত্র। অপরদিকে দিবারাত্রি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর নানা বক্তব্য প্রদান করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করা।

প্রকৃতপক্ষে তারা মুখে চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বললেও কাজেকর্মে কার্যকর কোন ভূমিকা দেখা যায় না। বরঞ্চ তাদের ভাবটা যেন চুক্তি বাস্তবায়িত হলে নিজেদেরই পিতৃপুরুষের সম্পত্তি খোয়া যাচ্ছে! তাই জনসংহতি সমিতি যখনই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে অভিযোগ করে, বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেয় এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানায়, তখনি তারা সরকারের

নীতি-নির্ধারকদের চেয়ে অতিউৎসাহী হয়ে 'চুক্তির অধিকাংশ বিষয় বা চুক্তির ৯৮% ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে', 'সব হবে, ধীরে ধীরে হবে, হচ্ছে', 'চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে জনসংহতি সমিতি ও সন্তু লারমা মিথ্যাচার করছেন', 'অনেক দেশে এ ধরনের চুক্তি পুরাপরি বাস্তবায়িত হয়নি' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। যেন জনসংহতি সমিতি তাদের কাছেই দাবি জানাচ্ছে! আর নিজেদের আসন ঠিক রাখার চিন্তায় ঘন ঘন 'চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক' বলে প্রলাপ করতে থাকেন। নিজেদের তোষামোদী ধ্যানে অন্ধ হয়ে তারা ভুলে যান যে, প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

উল্লেখ্য যে, চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করার কাজ। বলাবাহুল্য, চুক্তির আগে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৭২ হাজার জুম্ম ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার লক্ষাধিক জুম্ম পরিবার স্ব স্ব বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে ও মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তির অব্যবহিত পরে জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে দীপঙ্কর তালুকদার এমপিকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তিনি আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত ও পুনর্বাসন করার কথা থাকলেও জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের অবৈধ একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৩৮,১৫৬ সেটেলার বাঙালি পরিবারকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা দেন। যা চুক্তির সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

বলাবাহুল্য, চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতির প্রশ্নে দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর বাবুরা এ পর্যন্ত চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বা চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাদের তরফ থেকে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নিতে, সরকারের নিকট দাবি জানাতে বা এনিয়ে কোন আন্দোলন-কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। অথচ পার্বত্যবাসীর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হলেও তারা সরকারি যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালালে বা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা দিলে তার বিপরীতেই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ তারা সদা তৎপর ও সরব থাকেন। বস্তুত তারা যে অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছেন তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত বা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তাদের কাছে জরুরী বিষয় নয়। চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতন্ত্র বিকশিত হবে, পাহাড়ি-বাঙালি সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন হবে, চুক্তি অনুযায়ী বিশেষ শাসনব্যবস্থা জোরদার হবে, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক সমস্যার সমাধান হবে, সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক, সুবিধাবাদী ও ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের নোংরা রাজনীতির অবসান হবে -সেকারণেই তারা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে উৎসাহী নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর বাবুরা চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একেবারে নীরব। কিন্তু জনসংহতি সমিতি 'চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি' বলে অভিযোগ তুললেই তাতে তারা পাল্টা আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। সেকারণে তারা চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে একপ্রকার একপাশে সরিয়ে রেখে প্রায় প্রতিদিন 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী' ইত্যাদি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আখ্যা দিয়ে জনসংহতি সমিতিকে কাবু করার চেষ্টা জোরদার করছেন, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের দমন-পীড়ন চালিয়ে ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে এলাকাছাড়া করার চেষ্টা করছেন। আর এজন্য তারা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে, প্রকারান্তরে চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

আরও উল্লেখ্য যে, জামাত-বিএনপি ও মৌলবাদী গোষ্ঠী ১৯৯৭ পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যেভাবে বলেছিল 'চুক্তি সম্পাদিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম (ফেনী পর্যন্ত) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে' সেই অপপ্রচারের সাথে তাল মিলিয়ে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের অনেকে প্রচারনা চালাচ্ছেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে' ইত্যাদি। যেমন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনু গত বছরের মার্চে সংসদেই বলেছেন, 'পার্বত্যাঞ্চলকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্তু লারমা।' এসমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা যারা মনেপ্রাণে সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষী তারা দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন কিন্তু এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্মদের অধিকারের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা-সহানুভূতি নেই। সে কারণে সরকারি দলে সংশ্লিষ্ট থেকেও এনারা কার্যত জুম্ম বিরোধী ও চুক্তি বিরোধী ভূমিকাতেই সদা তৎপর থাকেন। জুম্মদের আন্দোলন ও অধিকারের কথা, এমনকি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবির কথা উঠলেই তেনারা দেশ গেল, বাঙালি মুসরমানেরা অধিকার হারাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ইত্যাদি বলে চিৎকার করে উঠেন এবং তথাকথিত দেশ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠেন।

পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদের চুক্তি বাস্তবায়নে নির্লিপ্ত ভূমিকা

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ জুম্ম জনগণের আন্দোলনের অন্যতম ফসল এবং পার্বত চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তারপরও এই পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা প্রায়ই চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এবং চুক্তি অনুযায়ী এই পরিষদটি কার্যকরকরণে খোদ পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদের মধ্যে কোন উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখা যায় না। তাদেরকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে অহস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগসমূহ হস্তান্তরে সরকারের সাথে দেনদরবার করতেও দেখা যায় না। বরঞ্চ পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার খর্ব করে কোন বিষয়/বিভাগ হস্তান্তর করা হলে তাতে তারা দেনদরবারের পরিবর্তে সুবোধ বালকের মতো হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করতে দেখা যায়।

পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুযায়ী 'আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়সাধণ করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে' মর্মে বিধান থাকলেও এবং এ বিষয়ে ১০ এপ্রিল ২০০১ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হতে 'আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর যথাযথ অনুসরণ এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন' এর পরিপত্র জারী করা হলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করছে না এবং নানাভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিরোধী কাজে জড়িত থাকেন।

এমনকি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদমর্যাদা যে কেড়ে নেয়া হয়েছে তা উদ্ধারে তাদেরকে তৎপর হতে দেখা যায় না। ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক মনোনীত এসব অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। এসব পরিষদগুলো এযাবৎ আর্থিক দুর্নীতি, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

সরকারের বেসামরিক আমলাদের কর্তৃক চুক্তিবিরোধী ভূমিকা

চুক্তির অব্যবহিত পরে তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান পরিলক্ষিত হলেও সাম্প্রতিককালে বেসামরিক প্রশাসনে চুক্তি বিরোধী ভূমিকা ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও জুম্মদের বিষয়ে যথাযথ ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা না থাকায় দেশের, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বেসামরিক আমলা তথা ডিসি, এসপি, ইউএনওসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি ও অধিকারের প্রতি যথাযথ আচরণ ও ভূমিকা পাওয়া যায় না। সামগ্রিকভাবে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্মদের আন্দোলন ও তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা'র জন্য পরিপত্র জারী করা হলেও পার্বত্য জেলার ডিসি, এসপিরাসহ সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করেন না। ফলে চুক্তি ও আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারছে না। বস্তুত ডিসি, এসপিরাসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা তারা এখনও তোয়াক্কা করেন না। তারা আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে উপেক্ষা করেই সাধারণ প্রশাসন থেকে শুরু করে ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

চুক্তি অনুযায়ী সার্কেল চীফগণ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধানকে লংঘন করে ২০০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'ডেপুটি কমিশনাররাও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিতে পারবেন বলে যে নির্দশনা দেয়া হয়েছিল তা তারা এখনও অনুসরণ করে চলেছেন। এমনকি তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। এর বদৌলতে অস্থায়ী বহিরাগত ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ভূমি বন্দোবস্তসহ চাকরি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে এবং জুম্ম জনগণকে বঞ্চিতকরণসহ সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সেসমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলায় সর্বমোট ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হয় এবং লীজ বাতিলকৃত প্লট সরকারের দখলে আনা হয়। কিন্তু উদ্বেগজনকভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করে থাকে।

গত ২৬-২৮ জুলাই ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে একতরফাভাবে (১) "ভূমি রেকর্ড সংশোধনে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ১৯৮৯ এর ৬৪(১)(ক) ধারা সংশোধন করে 'পূর্বানুমোদনের' স্থলে পরিষদের 'অনাপত্তি' গ্রহণের বিষয়টি সংযোজন করতে হবে'। (২) "পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদানের বিধান সম্বলিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর ৬৫ ধারাটি বিলোপ/বাতিল করতে হবে"- মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলাবাহুল্য, ডিসিদের কর্তৃক গৃহীত উক্ত উভয় সিদ্ধান্তই পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এর সাথে সাংঘর্ষিক।

গত ১ নভেম্বর ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সহকারী কমিশনার (গোপনীয় শাখা) অঞ্জন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক পত্রে 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা' এর পরিবর্তে 'খাগড়াছড়ি' ব্যবহার/লেখার এক নির্দেশনা জারী করা হয়। উক্ত পত্রে 'বিষয়: জেলার নাম শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে' উল্লেখ করে বলা হয় যে, 'উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রজ্ঞাপন নং- এমইআর/জেএ১১/৭৬/৮৩-৩৪৮, তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৩ খ্রি: মোতাবেক 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা' এর পরিবর্তে সরকারি সবক্ষেত্রে 'খাগড়াছড়ি' ব্যবহার/লেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।' জনসংহতি সমিতি 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক 'পার্বত্য জেলা' শব্দসমূহ বাদ দেয়ার প্রচেষ্টাকে এই অঞ্চলের বৈশিষ্টপূর্ণ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর আঘাত হানার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে' উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ জানায়। জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদের মুখে পরে উক্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হয়।

শুধু তাই নয়, সম্প্রতি জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রেও ডিসি, এসপিদের পক্ষ থেকে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এতে সভা-সমিতি ও মত প্রকাশ করার সাংবিধানিক অধিকারকে যেমনি খর্ব করা হচ্ছে, তেমনি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সামরিক আমলাদের কর্তৃক চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ও জুম্মবিরোধী ভূমিকা

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি তিন বাহিনীর সম্মতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অবশ্যই সেনাবাহিনীর এই ভূমিকা ও অবস্থান পাহাড়ি-বাঙালি অধিকাংশ মহলে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

অনেক ক্ষেত্রে আশির দশকের শুরুর দিকে অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তার মধ্যে যে 'আমরা কেবল ভূমি চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ নয়'- এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়। ফলে নানা ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের দমন-পীড়ন-উচ্ছেদের যন্ত্র হিসেবেই ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের যে ইতিবাচক ভূমিকা তাও এই দমনপীড়নমূলক ও একতরফা ভূমিকার কারণে ম্লান হয়ে যায়। যেহেতু এখনও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী অধিকাংশ সেনাক্যাম্প ও সেনাকর্তৃত্ব প্রত্যাহার করা হয়নি তাই এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক আমলাদের ভূমিকার তেমন কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও স্থানীয় সেনাকর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছরে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর অন্তত ১৯টি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। যে হামলায় অন্তত ১১ জন নিরীহ জুম্ম নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫২৩ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৫ জন নারী-শিশু, বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়েছে ১৩৫০টি এবং লুটপাট হয়েছে অন্তত ১০৮২টি বাড়ি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যত সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যতঃ সেনাবাহিনীই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেকপোস্ট বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো যাত্রীবাহী বাস-লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ গ্রামাঞ্চলে তল্লাসী অব্যাহত রেখেছে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ৬নং সিদ্ধান্তে "পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সাথে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ দায়িত্ব পালন করবে" এবং ১০নং সিদ্ধান্তে "পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশ পথে যেসব চেকপোস্ট রয়েছে সেগুলোকে আরও সক্রিয় করতে হবে"। যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বেসামরিকীকরণের অংশ হিসেবে সেনা, এবিপিএন, আনসার ও ভিডিপির সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান রয়েছে এবং তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ চেকপোস্ট তুলে নেয়া হয়েছে, সেখানে আবার নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশ পথে চেকপোস্ট সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া চুক্তি বাস্তবায়নের অনুকূলে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

উদ্বেগের বিষয় যে, সাম্প্রতিককালে সেনা-বিজিবি-পুলিশ কর্তৃক সন্ত্রাস দমনের নামে বা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে গ্রামে-শহরে ও বাড়িঘরে সামরিক অভিযান, তল্লাশী, ধরপাকড়, আটক, হয়রানি, মারধর, গ্রেপ্তার, মিথ্যামামলায় জড়িত করণ, হুমকী প্রদান, জুম্মদের একান্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি জোরদার করা হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশী টার্গেটের শিকার হচ্ছে চুক্তির পক্ষের জনসংহতি সমিতি, যুব সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সদস্যরা এবং জনসংহতি সমিতি ও চুক্তি সমর্থক নিরীহ গ্রামবাসীরা। এধরনের সেনা-বিজিবি-পুলিশী অভিযানে গত ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৩০ জনকে গ্রেপ্তার, ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি, ৮৯ জনকে মারধর এবং জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। নজিরবিহীনভাবে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কার্যালয়সহ কয়েকটি উপজেলা কার্যালয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছে এবং সমিতির দাপ্তরিক দলিলপত্রসহ কার্যালয়ে টাঙানো দলীয় নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ছবি পর্যন্ত তছনছ করে দেয়া হয়েছে, যাতে অত্যন্ত বৈরী মানসিকতার পরিচয় মেলে।

এমনকি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত বিষয়েও সেনাবাহিনী অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে এবং অনধিকার চর্চা করছে। গত ২৯ মে ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলায় আয়না চাকমা (১৭) তার বাড়ি থেকে বিলাইছড়ি বাজারে এসে বিবাহিত দোকানদার শিহাব উদ্দিন নামক এক ব্যক্তির দোকানে প্রবেশ করার পর ঐ দোকানদারের সাথে আয়নার অসামাজিক সম্পর্কের জের ধরে বাজার এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তা সামাজিক সালিশের মাধ্যমে সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু সমস্যাটি সামাজিকভাবে সমাধানের প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ আয়না চাকমার মা-বাবার মত না থাকা সত্ত্বেও আয়না চাকমাকে দিয়ে বিলাইছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে স্থানীয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও যুব সমিতির কয়েকজন সদস্যকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত স্বল্প বয়সী এই নারীকে চাপ দিয়ে মা-বাবার

কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে নিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরস্থ তিনটিলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দুপুরের দিকে পার্শ্ববর্তী মেয়োনি (মাইনি) সেনা জোন থেকে একদল সেনাসদস্য উপস্থিত হন স্কুলের শিক্ষকদের কক্ষে। এসেই তারা একটি তথ্য ছক বা অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মত প্রশ্নপত্র শিক্ষকদের হাতে ধরিয়ে দেয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলোর উত্তর দিতে বলে। এতক্ষণ ধরে যে শিক্ষকগণ স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়েছেন, এখন তাদেরকেই আবার সেনাসদস্যদের কাছে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করানো হয়। এসময় সেনাসদস্যরা কম্পিউটারে কম্পোজ করা প্রশ্নপত্রে 'আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস জানেন কি? -হ্যাঁ বা না, পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারের জন্য কোন নৃগোষ্ঠী আগে এসেছে?, ১৯৮২ সালে বাঙালিরা আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন হয়েছে কি না হয়নি?, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে এই চুক্তিটি যথাযথ কিনা? -হ্যাঁ বা না; প্রশ্নঃ আপনি নিজেকে কী মনে করেন- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি না আদিবাসী?; প্রশ্নঃ বিবাহ প্রথা কেমন হওয়া উচিত? একই জাতির মধ্যে না ভিন্ন জাতির মধ্যে? ইত্যাদি প্রশ্ন করেন। সবশেষে অনেকটা থলে থেকে বেড়াল বেড়িয়ে আসার মত একমাত্র এবং সর্বশেষ (জঘন্যও বলা যেতে পারে) মৌখিক প্রশ্নটি আসে এভাবে- 'চাকমা মেয়েরা বাঙালি বিয়ে করলে আপনাদের আপত্তি আছে কি না?' এভাবে বর্তমানে এমন কোন বিষয় নেই যাতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করছে না। বিভিন্ন উপজেলায় জনসংহতি সমিতির কর্মীদের নাম-গ্রাম থেকে শুরু করে ওজন-উচ্চতাসহ ব্যক্তিগত সব বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য নানাভাবে চাপ দিচ্ছেন সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা।

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ জোন অধিনায়কের পক্ষে উপ পরিচালক (এমও) অরিজিত কুন্ডু কর্তৃক সদর দপ্তর বরকল জোন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তথ্য চেয়ে জনসংহতি সমিতিকে এক চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। 'ব্যক্তিগত কার্ড প্রস্তুত করণ প্রসংগে' লেখা ওই চিঠিতে সদর দপ্তর রাঙ্গামাটি রিজিয়নের রাঙ্গামাটি সেনানিবাস পত্র নং ২৩.০১.৯৩১.১৩৬.০১.১৪৮.০১.১৮.১২.১৬ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ (সকলকে নহে) এর বরাত দিয়ে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সদস্যের নাম, ডাক নাম, বয়স, পুরুষ/মহিলা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, উচ্চতা, বুকের মাপ, চোখ, মুখমন্ডল, বর্ণনা, সনাক্তকরণ চিহ্ন, সম্প্রদায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বিবাহিত অবস্থা, স্বামী/ স্ত্রী, ছেলে কতজন মেয়ে কতজন, উত্তরাধিকারী, বন্ধু-বান্ধব, সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয় পূরণ করে ঐ কার্ড রাঙ্গামাটি সেনানিবাসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্প্রতি জানা গেছে, গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ নানিয়ারচরে গোপন এক সভায় জনৈক সেনা কর্মকর্তা বলেছেন, 'যতদিন সেনাবাহিনী থাকবে ততদিন ভূমি কমিশন আইন কার্যকর হবে না। কাজেই সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেই চলতে হবে...'। এর কিছুদিন আগে জানা গেছে, 'জনৈক সেনা কর্মকর্তা রাঙ্গামাটিতে বেশ কিছু সংবাদকর্মীকে নিজ কক্ষে ডেকে পাঠান এবং তাদের মোবাইল বন্ধ রাখতে বলেন। এক পর্যায়ে এক প্রকার শাসিয়ে এবং হুমকী দিয়ে বলেন যে, 'আমি চাই না, সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট কোন খবর মিডিয়ায় আসুক। না হলে.....'। এ ধরনের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই বিপদজনক বলতে হয়।

উন্নয়নের নামে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র ও কার্যক্রম

একদিকে যেমনি চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণের অধিকার খর্ব হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি জটিলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে উন্নয়নের নামে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রমের ফলে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে এ যাবৎ শত শত একর জুম্মদের জুমভূমি ও আবাসভূমি বেদখল করা হয়েছে, এখনও দখলের প্রক্রিয়া রয়েছে। বিশেষ করে বান্দরবানের নীলগিরি (কাপ্রু ম্রো পাড়া), জীবন নগর (সেপ্রু পাড়া), চন্দ্র পাহাড়, ডিম পাহাড় (ক্রাউডং), নীলাচল ও রাঙ্গামাটির সাজেক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে মোট ২৬টি গ্রামের অন্তত ৬৯৭টি ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার উচ্ছেদ ও ক্ষতির শিকার হয়েছেন বলে তথ্য রয়েছে। এছাড়াও যত্রতত্র পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী পর্যটন বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ারধীন বিষয় হলেও পার্বত্য জেলা পরিষদকে তোয়াক্কা না করেই এবং এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে এ সমস্ত পর্যটন ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী ও বিজিবির উদ্যোগে ক্যাম্প সম্প্রসারণ, নতুন ক্যাম্প স্থাপনের নামে প্রতিনিয়ত জুম্মদের ভূমি বেদখল করা হচ্ছে বা বেদখলের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, আঞ্চলিক পরিষদ ও চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিতে পাশ কাটিয়ে এবং আইন লংঘন করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে একপাশে সরিয়ে রেখে উন্নয়নের নামে জুম্মদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ ও বহিরাগত পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে জুম্মদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকার, সরকারের স্থানীয় কায়েমী স্বার্থবাদী ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের যোগসাজসে একতরফাভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সংযোগ নির্মাণ, রাঙ্গামাটি জেলার কাচলং ও সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে ইতোমধ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্যবাসী পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। বস্তুত চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে, পার্বত্য সমস্যার

৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রকৃত বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকার সক্রিয় রয়েছে অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু করা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকারকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায় চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে গোয়েবলসীয় কায়দায় নিরবিচ্ছিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে। সেই সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত অধিকার কর্মীদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করেছে।

● ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

গত ৯ আগস্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের এ যাবৎ তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ বান্দরবান জেলার সার্কিট হাউজে তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি আনোয়ার-উল হক-এর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কমিশনের সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অংশৈপ্রু চৌধুরী, চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বোমাং রাজা প্রকৌশলী উ চ প্রু চৌধুরী, মং সার্কেলের রাজা সাচিং প্রু অং ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আমিনুর রশিদ মোমিন উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর কার্যবিধিমালা প্রণয়নের পর ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্রের শুনানী বা বিচারিক কাজ শুরু করা, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন, কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে পুনরায় তুলে ধরা, দাখিলকৃত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, ১০ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২২,৮৬৬টি আবেদন কমিশনের নিকট জমা পড়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

উপজেলা ভিত্তিক ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা (১০ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত)

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা		খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা		বান্দরবান পার্বত্য জেলা	
উপজেলা	সংখ্যা	উপজেলা	সংখ্যা	উপজেলা	সংখ্যা
রাঙ্গামাটি সদর	২৯৬	খাগড়াছড়ি সদর	৮৮১	বান্দরবান সদর	১৭৫৩
নানিয়ারচর	৬৭১	গুইমারা	৬৪০	লামা	৮৮৫
কাউখালী	১৪৭৫	মাটিরাঙ্গা	১৩৫৮	আলিকদম	৩১৫
বিলাইছড়ি	২০৮	মানিকছড়ি	১৩৭০	থানছি	৯১
বাঘাইছড়ি	৩৪১	লক্ষিছড়ি	৪৪৭	রুমা	৩৮
কাপ্তাই	১৮৭৯	রামগড়	৯০৬	নাইক্ষ্যংছড়ি	২৮৮
রাজস্থলী	৩১০২	দীঘিনালা	১৫৭৮	রোয়াংছড়ি	১১৮২
বড়কল	৮৫৬	পানছড়ি	৬৪১		
জুরাছড়ি	৩	মহালছড়ি	৫৫২		
লংগদু	১১১০				
মোট	৯,৯৪১	মোট	৮,৩৭৩	মোট	৪,৫৫২

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য ভূমি কমিশন গঠিত হলেও কমিশনের নেই পর্যাপ্ত জনবল, তহবিল ও পরিসম্পদ। কমিশনের এ যাবৎ একজন সচিব, একজন রেজিস্ট্রার ছিল। কিন্তু গত নভেম্বরে কমিশনের সচিবকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। ফলে কমিশনে কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো এখন মাত্র একজন রেজিস্টার রয়েছে। অপরদিকে কমিশনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো কোন তহবিল নেই। ফলে জনবল ও তহবিলের অভাবে কমিশনের কাজ চালিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় কমিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হলেও তহবিল, জনবল ও পারিসম্পদের অভাবের কারণে এখনো রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান থেকে খাগড়াছড়িতে গিয়ে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্র জমা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের পর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত কমিশনের দ্বিতীয় সভায় সংশোধিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ অনুসারে কমিশনের কার্যবিধিমালার খসড়া তৈরির জন্য কমিশনের অন্যতম সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তদনুসারে খসড়া কার্যবিধিমালা তৈরি করে তা তিনি ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকার সেই কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। ফলে কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে কমিশনের ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলার শুনানী বা বিচারিক কাজ শুরু করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

● প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাস্ক ফোর্সের

চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় টাস্কফোর্সের সদস্যদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের প্রতিনিধি সন্তোষিত চাকমা বকুল উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও পুনর্বাসন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের মধ্যে পূর্বতন চাকরিতে পুনর্বহালকৃত ব্যক্তিদের সিনিয়রিটি প্রদান, ঋণ গ্রহণকারী শরণার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও তাদের ঋণ মওকুফ, টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলী (টিওআর) সংশোধন, টাস্কফোর্সের সদস্যদের সম্মানী ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে টাস্কফোর্স কমিটি গঠিত হলেও ১৯৯৮-২০০১ সালে টাস্কফোর্সের তৎকালীন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদারের আমলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করা হয়। সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালিদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ আজ অবধি অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

● পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত মামলার শুনানী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে দায়েরকৃত আপিল মামলার শুনানী উদ্বেগজনকভাবে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালের এপ্রিলে আপিল আবেদনের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে আপীলকৃত এই মামলার শুনানী শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন শুনানী শুরু হয়নি। এরপর যথাক্রমে ৪ জানুয়ারি ও ২৪ জানুয়ারি মামলাটির শুনানীর তালিকায় ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারে সময়ের অভাবে শুনানী শুরু হতে পারেনি। সর্বশেষ ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি হাসান ফোয়েজ সিদ্দিক, বিচারপতি মির্জা হুসাইন হায়দার ও বিচারপতি মো: নিজামুল হক-এর সমন্বয়ে গঠিত পাঁচ সদস্যক বেঞ্চে পার্বত্য চুক্তি সংক্রান্ত আপিল মামলার (সিভিল আপিল, ৯৪/২০১১, সি.এ. ৯৫/১১) শুনানীর জন্য ১৫ ক্রমিকে তালিকাভুক্ত ছিল।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ এপ্রিল ২০১০ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এই স্থগিতাদেশ নিয়মিত আপিল মামলা পর্যন্ত বর্ধিত হয়। সর্বশেষ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপিল আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশ জারি করে।

● চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তিতে সরকারি ক্রোড়পত্র ও অপপ্রচার

সরকার প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ২০১৬ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। উক্ত ক্রোড়পত্রে বরাবরের মতো সরকার এবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে অসত্য বক্তব্য প্রদান করেছে।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৯ বছর' শিরোনামে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রমা রাণী রায়ের প্রবন্ধে পূর্বের মিথ্যাচার পুনর্ব্যক্ত করে উল্লেখ করেন যে, "শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারা আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।" তিনি আরো বলেন, "ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৩০টি বিভাগ/বিষয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে, ৩০টি বিষয়/বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং ২৮টি বিষয়/বিভাগ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনো দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের এই বাস্তব চিত্র তুলে ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে গত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ" সম্বলিত ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন এবং তৎসঙ্গে সহায়ক দলিল হিসেবে ১৬টি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জমা দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় অব্যাহতভাবে মিথ্যাচার করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মোট ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ ১৭টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে। তম্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে ১০টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে যুব উন্নয়ন বিষয় (রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পরিষদে) এবং পূর্বে হস্তান্তরিত শিক্ষা বিভাগের অধীনে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। মহাজোট সরকারের বর্তমান মেয়াদে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান, জুম চাষ, পর্যটন (স্থানীয়) ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (খাগড়াছড়ি পরিষদে), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধীন রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারি) এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন সরকারি শিশু সদন মোট ৭টি কর্ম/অফিস হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে হস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগের অধীনস্থ উল্লেখিত ৭টি কর্ম/অফিসগুলোকে এক একটি স্বতন্ত্র বিষয়/বিভাগ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে রাঙ্গামাটি,

খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাক্রমে ৩০, ৩০ ও ২৮টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তর হয়েছে বলে পার্বত্য মন্ত্রণালয় অপপ্রচার চালাচ্ছে যার মধ্য দিয়ে এটা অনেকে ভুল ধারনা করতে পারেন যে, ৩৩টি বিষয়/বিভাগের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়/বিভাগই হস্তান্তরিত হয়েছে। বস্তুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলে তালিকাভুক্ত ৩৩টি বিষয়/বিভাগের মধ্যে মাত্র ১৭টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এই ১৭টি বিষয়/বিভাগের অধীনে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ৩০টি করে এবং বান্দরবানে ২৮টি কর্ম/অফিস রয়েছে। 'বিষয়/বিভাগ' এবং 'কর্ম/অফিস' এর মধ্যে উদ্দেশ্যে- প্রণোদিতভাবে গুলিয়ে ফেলে পার্বত্য মন্ত্রণালয় এই বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে চলেছে।

উক্ত ক্রোড়পত্রে অতিরিক্ত সচিব রমা রাণী রায়ের প্রবন্ধে "পার্বত্যাঞ্চলের দীর্ঘদিনের চলমান সংঘাতকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়" বলে উল্লেখ করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে ক্রোড়পত্রের কোথাও গুরুত্বারোপ করা হয়নি। সস্তা বাহবা অর্জনের জন্য এবং চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে ক্রোড়পত্রে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফিরিস্তি এবং চুক্তির ফলে সশস্ত্র সংঘাতের অবসানের কথাই ঘুরেফিরে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ক্রোড়পত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীতে বলা হয় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা।" পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তা সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সমন্বয়ে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে, যে পরিষদগুলোর উপর সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন, পরিবেশসহ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও বহিরাগতদের নিকট প্রদত্ত ইজারা বাতিল, সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদেরকে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে যে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই রাজনৈতিক সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি। অথচ ক্রোড়পত্রে এসব বিষয়ে কেউই তুলে ধরেনি। তার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, সরকার এসব মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে আন্তরিক তো নয়ই, মোটেই আগ্রহীও নয়।

পার্বত্যবাসীরা নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করবে সেরূপ স্পিরিট নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হলেও সেসব পরিষদের আইনগুলো এখনো যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়নি। ফলে এই পরিষদগুলো অনেকটা অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল পূর্ণাঙ্গ পরিষদ গঠনের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান-সদস্যদের নিয়ে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে পরিচালনার ফলে এই পরিষদগুলো দুর্নীতি ও দলীয়করণের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যে পরিষদগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ নেই এবং যেখানে গণমানুষের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই, সেখানে যদি 'স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্ব প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে' বলে অতিরিক্ত সচিব রমা রাণী রায় তাঁর প্রবন্ধে যে দাবি করেছেন তা সত্যের অপলাপ ও অপপ্রচার বৈ কিছু নয়। অপরদিকে যেখানে পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার মানুষের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে দেয়, সেখানে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এক নবযাত্রার শুভ সূচনা' তো হতেই পারে না, উপরন্তু সেই ধরনের উন্নয়ন মানেই জুম্মদেরকে এধরনের চরম আতঙ্ক, উদ্বেগ ও বঞ্চনার মধ্যে ঠেলে দেয়।

চুক্তির মধ্য দিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের সংঘাতের অবসান' হলেও চুক্তির পর জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস করা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলছে। অথচ সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে "শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে" বলে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি তাঁর বাণীতে পার্বত্য অধিবাসীদেরকে চরম পরিহাস করেছেন। অপরদিকে, যেখানে খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের খেটে-খাওয়া নিরীহ অশিক্ষিত কালিবন্ধু ত্রিপুরাকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে গ্রেফতার করে তার সাজানো ঘরসংসার তছনছ করে দেয়, যেখানে সেনা-পর্যটনের ফলে রুইলুই-এর দুই গ্রামের ৬৫ পরিবার ত্রিপুরা উচ্ছেদ আতঙ্কে অনিশ্চিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয় বা রুমার বগালেকে বংশ প রম্পরায় বসবাসরত ৩১টি বম পরিবারকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়, সেখানে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ক্রোড়পত্রে কিভাবে বলতে পারেন যে, 'পার্বত্য জনপদে ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি'? এ ধরনের বিধ্বংসী ঘটনা তিন পার্বত্য জেলায় সর্বত্রই অহরহ ঘটেই চলেছে। বস্তুত চরম দালালিপনা ব্যতীত স্বজাতির এই কঠিন সংকটে কেউ এ ধরনের নিঃলজ্জ মিথ্যাচার করতে পারে না।

ক্রোড়পত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী তাঁর বাণীতে বলেছেন, "শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সত্যিই কি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করছেন? গত ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনে এ কমিটির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দুই বছরের অধিক কাল ধরে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। কাগজে-পত্রে কমিটি গঠিত হলেও এ কমিটির নেই কোন অফিস, জনবল ও তহবিল। সুতরাং যে কমিটির দায়িত্ব হচ্ছেচুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ ও ত্বরান্বিত করা, সেই কমিটির অবস্থা যদি তথৈবচ হয় বা সেই কমিটি যদি অথর্ব ও অচল হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেই কমিটি কিভাবে 'পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে' বলে যে দাবি করা হচ্ছে তা কতটুকু অন্তসারশূণ্য তা বলাই বাহুল্য।

বিশেষ প্রতিবেদন

গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত

রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমা'র শহীদ বেদীতে ফুল দিচ্ছেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

১০ নভেম্বর ২০১৬ তিন পার্বত্য জেলা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, সাবেক সাংসদ, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর বিভেদপন্থী ও বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ- দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতমূলক অতর্কিত আক্রমণে তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা এম এন লারমা। সেদিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাপুরুষোচিত সশস্ত্র আক্রমণে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে বরণ করেছেন পানছড়ি আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রবাস লারমা, মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারী পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি), সার্জেন্ট সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা (অর্জুন)।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার জেলা ও উপজেলা সদরে প্রভাত ফেরী, পুষ্পমাল্য অর্পণ, স্মরণসভা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়ানো ইত্যাদি কর্মসূচি এবং '১০ই নভেম্বর স্মরণে' নামক স্মরণিকা ও পোস্টার প্রকাশ করা হয়।

রাঙ্গামাটিঃ এম এন লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙামাটি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়। স্মরণসভায় আরো বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, অধ্যাপক মং সানু চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরামের সভাপতি শিশির চাকমা ও জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা প্রমুখ। স্মরণসভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক আনন্দ জ্যোতি চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, এম এন লারমার আদর্শ প্রতিপালন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাঁর আদর্শকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরতে হবে। এম এন লারমা আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন। এম এন লারমা স্মৃতিচারণ করে দেবাশীষ রায় বলেন, ১৯৬০ সালে কর্ণফুলীতে বাঁধ দেয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন এম এন লারমা। সে সময় তার মতো মানুষ যদি আরো বেঁচে থাকত তাহলে কাপ্তাই বাঁধ হতে পারত না। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যে করুণ অবস্থা তা হতো না।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত নয় তারাই চুক্তির সুফল ভোগ করছেন। তারা চুক্তির বিরোধিতা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের দিকে তাকালে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। শ্রী লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে যারা দায়িত্বে আছেন তারা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তারা চুক্তিবিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। তারা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে চলেছে।

স্মরণসভার আগে সকাল ৮:০০ টায় রাঙ্গামাটি শহরের রাজবাড়ী এলাকার শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রভাত ফেরি শুরু হয়। প্রভাত ফেরিটি বনরূপা পেট্রল পাম্প ঘুরে শিল্পকলা একাডেমীতে এসে শেষ হয়। এরপর এম এন লারমার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে। এরপর একে একে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দলের নেতারা এম এন লারমার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি, বরকল, লংগদু, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, কাপ্তাই, কাউখালী উপজেলার সদর ও বিভিন্ন ইউনিয়নে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে প্রভাত ফেরী, পুষ্পমাল্য অর্পণ, স্মরণসভা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়ানো ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়।

বান্দরবান: জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো মামলা থাকার কারণে জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আত্মগোপনে থাকায় জনসংহতি সমিতির পক্ষে জেলা শহরে এম এন লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয়নি। তবে জেলার ছয়টি উপজেলায় জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সকালে শোক র‌্যালি ও শোকসভা এবং সন্ধ্যায় ফানুসবাতি ওড়ানো হয়। ডুংরি হেডম্যানপাড়ার কার্বারি (গ্রাম প্রধান) চাইকিং অং মারমার সভাপতিত্বে আয়োজিত শোকসভায় বক্তব্য দেন জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মংমং মারমা, সহ সভাপতি সুমন তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির সভাপতি দীপু মারমা প্রমুখ।

জনসংহতি সমিতির রুমা থানা শাখার উদ্যোগে রুমা উপজেলায় শোক র‌্যালি, আলোচনা সভা ও ফানুসবাতি ওড়ানোর কর্মসূচি পালন করা হয়। এ ছাড়া রোয়াংছড়ি, থানচি ও আলীকদমেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

ঢাকা: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহনতি মানুষের প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকীকে সামনে রেখে এক স্মরণসভা আয়োজন এবং স্মরণসভার পরে মাদল ও সমগীতের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কমিটির আহবায়ক ডঃ মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে এবং কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রোবায়েত ফেরদৌসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি। এম এন লারমার বিপ্লবী স্মৃতি, জীবন দর্শন ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাবেক তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরিন আখতার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, এএলআরডি নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ শামসুল হুদা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা প্রমুখ।

স্মরণসভা শুরু হওয়ার আগে প্রয়াত এই বিপ্লবী নেতার শহীদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অস্থায়ী বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এর পরে এম এন লারমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্মরণভায় জাতীয় কমিটির পক্ষে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ঈষানী চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে না পারা ছিল একটি জাতীয় ভুল। আদিবাসীদের প্রতি অন্যায় অবিচার চলমান রয়েছে। পার্বত্য চুক্তির এত বছর পরেও তার সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশৃঙ্খলা রয়ে গেছে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে সংগ্রাম সে সংগ্রাম পাহাড় সমতলের আদিবাসীদের একত্রিত করতে পেরেছে। বিশিষ্ট গবেষক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ছিলো শোষনহীন, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক বিপ্লবী। তিনি উগ্র জাত্যভিমানী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তার আন্দোলন ছিলো মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য।

সাবেক তথ্য কমিশনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, এম এন লারমার আন্দোলন ছিল দেশের নিপীড়িত নির্যাতিত সকল মানুষের অধিকারের জন্য। জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরিন আখতার বলেন, আদিবাসীদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যতাকে সংরক্ষণ করতে না পারলে পৃথিবীর যে ইতিহাস সে ইতিহাসের সাথে বেঈমানী করা হবে। নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসীদের অধিকার থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা বেড়ে চলেছে।

স্বাগত বক্তব্যে কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সঞ্জীব দ্রং বলেন, বাংলাদেশে যখন সংবিধান রচনা করা হয় তখন আমরা মনে করেছিলাম এ সংবিধান হবে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর, ধর্মনিরপেক্ষ, শ্রেণিহীন সংবিধান। কিন্তু যে সংবিধান আমরা পেয়েছি তা বাংলাদেশে বসাবাসরত জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যলঘু, আদিবাসীদের কথা বলে না। সংবিধানের সেই বিষয়টি একমাত্র এম এন লারমা অনুধাবন করে বলেছিলেন, এ সংবিধান দেশের কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের কথা বলেনা।

রাজশাহী: এম এন লারমার ৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আদিবাসী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি উদ্যোগে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এর রাজশাহী গণকপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভা শেষে শহীদ নেতা এম এন লারমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিবাসী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত মাহাতো। বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি উপেন রবিদাস, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী কলেজ শাখার

২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষোভ ও প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি পালিত

দশদফার ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ জোরদার করুন'- শ্লোগানকে সামনে রেখে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের গড়িমসির ফলে সরকারের প্রতি চরম ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে। ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ৩০ নভেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন এবং ২ ডিসেম্বর তিন পার্বত্য জেলায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সদরে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ এবং ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে' শীষক প্রতিবেদন ও পোস্টার প্রকাশ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সংবাদ সম্মেলন

৩০ নভেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরার সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বক্তব্য প্রদান করেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী রূপম।

সংবাদ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ইত্যাদিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন করা; আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং স্থানীয় পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা; প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, যথাযথভাবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা ও সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পূর্ব-ঘোষিত দশদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে নেয়ার ঘোষণা করে জনসংহতি সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে চলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঘোষিত দশদফা কর্মসূচি হলো–

১. হরতাল;
২. জলপথ, স্থলপথ, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কার্যালয় অবরোধ;
৩. অর্থনৈতিক অবরোধ;
৪. জনগণ কর্তৃক সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস বর্জন;
৫. জনগণ কর্তৃক আদালত বর্জন;
৬. ছাত্র ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জন;
৭. পর্যটন বর্জন ও অবৈধ পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন প্রতিরোধ;
৮. অবৈধভাবে জমি অধিগ্রহণ ও বেদখল প্রতিরোধ;
৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধ;
১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী জুম্ম রাজনৈতিক দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সামাজিকভাবে বর্জন ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯ বছর: স্থানীয় জনগণের ভূমি অধিকার ও বাস্তবতা' শীর্ষক আলোচনা সভা

১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ ঢাকার দি ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯ বছর: স্থানীয় জনগণের ভূমি অধিকার ও বাস্তবতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, সাবেক তথ্য কমিশনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল। স্বাগত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা।

১৯ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারাগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে সভাপতির বক্তব্যে

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য এলাকায় শোষণ-বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুবিধ প্রশাসন ও কর্তৃত্ব চলছে যেটাকে এককথায় অরাজকতা বলা যেতে পারে। সেখানকার কোন মানুষের নিরাপত্তা নেই। পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে সরকারের অনেক কর্তাব্যক্তি, নীতিনির্ধারক মহলের অনেকজন প্রায় সময়ই খুবই দৃঢ়ভাবে বক্তব্য ও অঙ্গীকার দিয়ে থাকলেও গত ১৯ বছর ধরে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি। এই বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকেরা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী, সম্প্রদায়িক, প্রগতি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল হওয়ায় আজও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিভিল ও সামরিক আমলাদের অসহযোগিতা বড় বাধা। সিভিল প্রশাসনকে সহায়তার নামে অপারেশন উত্তরণ জারী করা হয়েছে। কিন্তু আদৌতে তারা সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সেনাশাসনে পাহাড়ের জনজীবন চরমভাবে অতিষ্ঠ ও নিস্পেষিত। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পাহাড়ে বাঙালি-আদিবাসীর জনসংখ্যা সমান করা হয়েছে। পর্যটনের নামে পাহাড়ে আদিবাসীদের জমি দখল হচ্ছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এবং ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সরকারের দালালি করছেন বলে অভিযোগ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, চুক্তি করে চুক্তি প্রতিপালন না করা কোন সভ্য মানুষের পরিচায়ক হতে পারে না। এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমি মনে করি ভূমি সমস্যাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের এক নম্বর সমস্যা। পাহাড়ি নারীদের প্রতি সহিংসতাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে আরো উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে।

চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের প্রতি সরকার বৈষম্যমূলক আচরন করছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন কার্যত কাজ করতে পারছে না। চুক্তি অনুযায়ী যে টাস্কফোর্স হয়েছে তাতে ভারত প্রত্যাগতদের কিছুটা পুনর্বাসন করা হলেও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। তারা মানবেতর জীবন ধারণ করছে। টাস্কফোর্স কার্যত অচল অবস্থায় রয়েছে। তিনি পার্বত্য চুক্তির মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার দাবি জানান এবং পাহাড়ের অনাকাঙ্খিত যে কোন ঘটনা এড়ানোর জন্য মিশ্র পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, পার্বত্য চুক্তির বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। চুক্তির বাস্তবায়ন সংখ্যা দিয়ে মাপা ঠিক নয়। ভূমি কমিশন কর্তৃক এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়ার পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তির প্রাক্কালে তৃতীয় কোন পক্ষ ছিলো না। দুই পক্ষের আলোচনায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সেটি অব্যশই নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা একাধিক প্রশাসন দেখতে পাই। যেটি মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাহাড়ে সুবিধা এসেছে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী মূল বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারের আচরণ লজ্জাজনক। যেমন গাইবান্ধায় আদিবাসী সাঁওতালদের উপর হত্যা ও হামলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দুদের উপর হামলা। সরকার কেন পার্বত্য এলাকায় নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে, কেন তাঁদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে না সেটি আমাদের বুঝতে হবে।

শামসুল হুদা বলেন, নানা বাধা সত্ত্বেও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে এগিয়ে নিতে হবে। ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু ভূমি কমিশন আইনের বিধিমালা এখনো হয়নি বলে তিনি জানান। এটির জন্য যেন আবার আলোচনা করতে সময়ক্ষেপণ করা না হয়। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সমন্বয় করে বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী সেটেলারদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা হোক।

সঞ্জীব দ্রং স্বাগত বক্তব্যে বলেন, এখানে সরকারই প্রধান পক্ষ। তাই সরকারকেই এই চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। এ চুক্তির মূল বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ী-বাঙালি উভয়েই জন্যই মঙ্গলজনক। নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল রাজনীতিক দল, মিডিয়াকে এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে পার্বত্যবাসীর ভূমি অধিকার ও বাস্তবতা প্রসঙ্গে পল্লব চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন যথাযথভাবে কার্যকরকরণের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করা; 'ভূমি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ ও জরুরী ভিত্তিতে জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা; অবৈধভাবে রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্ধকৃত জমির ইজারা বাতিল করা; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং স্থানীয় পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা; প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা; সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি সুপারিশ পেশ করেন।

ঢাকায় আলোচনা সভা

২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ঢাকার সুন্দরবন হোটেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। বক্তব্য রাখেন ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য নূর আহমেদ

বকুল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার সারা হোসেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল ও অধ্যাপক সৌরভ শিকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিমন চিসাম, এডভোকেট প্রকাশ বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে জাতীয়ভাবেই সমাধান করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আক্ষেপের সুরে বলেন, ১৯ বছর আগের যে অনুভূতি সেই অনুভূতির সাথে আজকের অনুভূতির যোজন যোজন পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে অধিকাংশই মিথ্যার বুলি আউরানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, ৪৬ বছর আগে বঙ্গবন্ধুর সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অবস্থা ছিল তা ২০১৬-তে এসে আরো খারাপ হয়েছে। ৪৬ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অলিখিত সেনাশাসন চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ নতুন করে জেগেছে। সরকার যদি এখনো জুম্ম জনগোষ্ঠীকে ঘুমিয়ে আছে মনে করে তবে ভুল করবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে ১০ দফা কর্মসূচীতে সরকার যে ভাষায় বাধা দেবে সে ভাষায় জবাব দেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা বলে উল্লেখ করে বলেন, রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। সরকারের কলুষিত মনোভাবের নিন্দা করে তিনি বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কাজ না করে চুক্তিবিরোধী তথাকথিত সমঅধিকার, হেফাজত ইসলামকে সমর্থন দিয়ে চলেছে। তিনি আয়োজিত সমাবেশকে জাতীয় প্রতারণা, মিথ্যাচার বিরোধী সমাবেশ বলেও উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, যে দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ করে পালন করার কথা ছিল সেই দিনটি পালন করতে হচ্ছে বেদনাহুত মন নিয়ে। এর জন্য সরকারের কথা দিয়ে কথা না রাখার কলুষিত চরিত্রকে দায়ী করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সেখানকার স্থায়ী সকল আদিবাসী জুম্ম-বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য করা হয়েছিল বিধায় এ আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, সরকারের দোয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিল চুক্তিতে উপনিত হওয়ার জন্য। সরকারের থেকে বিভিন্ন সময় ৪৮টির অধিক ধারা বাস্তবায়নের যে মিথ্যা প্রচার তিনি তার নিন্দা জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে ষড়যন্ত্রকারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতারণা করছে। সরকারের সদিচ্ছার অভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। দীর্ঘ ১৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। সামনের বছর দুই দশক পূর্ণ হবে। অথচ সরকার এখনো বলছে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঝখানে তারা সময় পায়নি। বিএনপি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাদ দিলে দীর্ঘ ১৫ বছর এই সরকার ক্ষমতায় ছিল। তাহলে ১৫ বছর কি কম সময়? আর কত বছর লাগবে? অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের উপনিবেশে পরিণত করে জাতিগত নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে জাতিগত নিধনের সাথে ইসলামীকরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সংগ্রামকে কখনো অস্ত্র দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর এ যৌক্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনকেও দমিয়ে রাখা যাবে না।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন করছে চুক্তির এক পক্ষকে উপেক্ষা করে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে প্রহসন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য নূর আহমেদ

বকুল বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র- এ চারনীতির ভিত্তিতে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা আজ ভুলণ্ঠিত। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামীকরণ, গণতন্ত্রের নামে ভোটের রাজনীতি, জাতীয়তাবাদের নামে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের নামে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, পার্বত্য চুক্তিকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। যে ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছিল তা ভিত্তিহীন বলেও উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে যেখানে চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করার কথা, সেই জায়গায় চুক্তি বাস্তবায়ন না করে কালক্ষেপণ করা অত্যন্ত দু:খজনক।

স্বাগত বক্তব্যে শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এখনো প্রতিনিয়ত শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। চুক্তির ধারাগুলোকে উপেক্ষা করে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে অলিখিত সেনাশাসন বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় যে কোন সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারো অশান্ত হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেক্ষেত্রে সরকারকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ

২ ডিসেম্বর চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে র‍্যালী, গণসঙ্গীত ও গণসমাবেশের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনের সাংসদ উষাতন তালুকাদার। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসার সঞ্চালনায় রাঙামাটি জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, ঐক্য ন্যাপের চট্টগ্রাম শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য পাহাড়ী ভট্টাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ফারুক হোসেন, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, রাঙামাটি জেলা যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা।

সকালে শহরের বিজয় সরণি এলাকা থেকে মিছিল বের করে জনসংহতি সমিতি। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জিমনেসিয়াম চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ও সাংসদ ঊষাতন তালুকদার বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের ওপর নির্যাতন ও দমন-পীড়ন চালাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী। নানাভাবে দখল করা হচ্ছে জুম্ম জনগণের ভিটেমাটি। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আমাদের শত্রু ভাববেন না। আমরা বেশি কিছু চাই না। আমরা শুধু চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই। চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ে শান্তি আপনা-আপনি চলে আসবে।'

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ে আন্দোলন ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এ জন্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

রাঙ্গামাটির গণসমাবেশে খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি, মানিকছড়ি, গুইমারা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা থেকে অনেকে যোগদান করে। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি ও রাজস্থলী উপজেলায় জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গণসমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

বান্দরবানে আলোচনা সভা ও সমাবেশ

২ ডিসেম্বর দুপুরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বান্দরবান শহরে বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরের সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াইংচ প্রু মাস্টার। প্রধান অতিথি ছিলেন মানবাধিকার নেত্রী ডনাইপ্রু নেলী মারমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন রুমা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য অংথোয়াইচিং মারমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডনাই প্রু নেলী বলেছেন, 'পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ১৯ বছরেও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি

বস্তবায়নে সরকার এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে আরো আন্তরিক হতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তাও কারো কাম্য নয়। পাহাড়ের মানুষ শান্তি চায়। পাহাড়ের ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকার ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করেছে। আমরা এ আইন কার্যকর দেখতে চাই।' সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও সামাজিকভাবে চুক্তিবিরোধী কর্মসূচিতে সক্রিয় রয়েছে সরকার। চুক্তি বাস্তবায়নের নামে সরকার নানা ধরনের টালবাহানা করছে।

উল্লেখ্য, শোভাযাত্রায় অংশ নিতে আসা লোকজনকে জেলা শহরের প্রবেশমুখ কালাঘাটায় বাধা দেওয়া হয়েছে। তল্লাশির কথা বলে সেখানে বেশ কয়েকটি গাড়িও আটকে রাখা হয়। এসব কারণে শত শত লোক চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি। তবে সেনাবাহিনী থেকে বলা হয়েছে যে, কাউকে আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়িতে সোনাইছড়ি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসংহতি সমিতির নেতা থোয়াইক্যাচিং মারমার সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য দেন জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি মংমং মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতি থোয়াইঅং রাখাইন, সাধারণ সম্পাদক মংথেনহ্লা রাখাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যজঅং রাখাইন, জনসংহতি সমিতির বাইশারী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নিউহ্লা মং মারমা, জনসংহতি সমিতির উপজেলা যুগ্ম সম্পাদক সুমেন তঞ্চঙ্গ্যা, উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ তংচঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির দোছড়ি ইউনিয়ন সভাপতি ক্যাহ্লা চিং চাক, নাইক্ষ্যংছড়ি পিসিপি সভাপতি দিপু মারমা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, পাহাড়ে অপহরণ ও খুনসহ অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে চুক্তির মৌলিক দিকগুলো এখনো বাস্তবায়ন করেনি। নাইক্ষ্যংছড়িতে পাঁচ-ছয়জন নিরীহ পাহাড়ি খুন ও অপহরণের শিকার হয়েছে। সম্প্রতি গত ২৪ নভেম্বর দোছড়ি ইউনিয়নের কামিছড়া মাসিবা পাড়া থেকে মংহ্লা চিং মারমা (৪৫), থুইহ্লা মং মারমা (৩২) ও ক্যাচিং থোয়াই মারমা (২২) এর সন্ধান দিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি দাবি জানিয়ে বক্তারা অনতিবিলম্বে অপহৃতদের উদ্ধারের আল্টিমেটাম দেন। পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে নিখোঁজ পাহাড়িদের উদ্ধার করানো হলে নাইক্ষ্যংছড়ি অচল করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন জনসংহতি সমিতির নেতারা। এছাড়া আলিকদম, লামা, রুমা, থানছি ইত্যাদি উপজেলায়ও জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে আলোচনা সভা

২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সকল কার্যক্রমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, পাহাড় থেকে সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামস্থ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের উদ্যোগে গণসঙ্গীত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নারী নেত্রী শহীদ জায়া বেগম মুশতারি শফি। উদযাপন কমিটির আহবায়ক তাপস হোড়ের সভাপতিত্বে সমাবেশে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক হোসাইন কবির, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মহসিন চৌধুরী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক সাহা, অধ্যাপক প্রদীপ কুমার চৌধুরী, ঐক্য ন্যাপের চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি এ্যাড. এ এম মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুখপত্র 'আদিবাসী বার্তা'র মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেগম মুশতারি শফি বলেন, আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক জায়গায় গিয়েছি। সকল জায়গায় অগণিত আদিবাসী আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। কোন সরকার আদিবাসীদের আপন করে নিতে পারেনি। তিনি বলেন, সন্তু লারমার নেতৃত্বে যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে তা কিন্তু এখনো সরকার বাস্তবায়ন করেনি। চুক্তির কিছু দফা বাস্তবায়িত হলেও মুল বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। দীর্ঘ সময়ে চুক্তি বাস্তবায়ন না

করায় তিনি সরকারকে সমালোচনা করেন। তিনি আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের সুদৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করে বলেন, আদিবাসীদের যে কোন আন্দোলনে তিনি সাথে থাকবেন। অধ্যাপক হোসাইন কবির বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে জিয়া এবং এরশাদের সময়ে সেটেলারদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমতলের অনেকে মনে করেন পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ভূমি রয়েছে এবং তা দেশেরই অংশ, সেখানে যে কেউ থাকলে আপত্তি কিসের? কিন্তু ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং পার্বত্য অঞ্চল যে শাসন বহির্ভূত এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল একটি বিশেষ অঞ্চল এই কথাটি সমতলের মানুষ বুঝতে চাচ্ছে না কেন? ব্যবসায়ীরা ইকোট্যুরিজম বলতে বুঝে থাকে অর্থনীতি। কিন্তু ইকো ট্যুরিজম তো পরিবেশ বান্ধব পর্যটন। ইকোট্যুরিজম মানে যদি মুনাফাকে শুধু বুঝানো হয় তাহলে সেটা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয় অথচ অপপ্রচার করছে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবকি পক্ষে এখনো সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি, বন ও পরিবেশ কোনটিই পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করেনি। পার্বত্য অঞ্চলে ৬টি ক্যান্টেনমেন্ট ব্যতীত সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা থাকলেও এখনো তিন শতাধিক অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প রয়েছে। চুক্তি পরবর্তী ১৯ বছরে একটিও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে দেশের সুশীল সমাজেকে আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির কথা বলে অপারেশন উত্তরণ বহাল রাখা সরকারের আদিবাসীদের সাথে এক ধরনের প্রতারণা। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের নামে সরকার ৬৯৬টি ম্রো, ত্রিপুরা ও বম পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোন নজর নেই বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে চুক্তির সময় পার্বত্য অঞ্চলে যে সেনা প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন তা এখনো একই রয়েছে। তাহলে কোথায় শান্তি? কোথায় স্থিতিশীলতা? তিনি বলেন, পার্বত্য চুক্তি কারোর কোন করুণার ফসল নয়, এই চুক্তি পার্বত্য আদিবাসীরা আন্দোলন করে, জীবন দিয়ে অর্জন করেছে।

সমাবেশে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মহসিন চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অপার সম্ভাবনা সেটাকে কাজে লাগানো সম্ভব কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বক্তারা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ধীরে চলো নীতির সমালোচনা করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করার করার জন্য জোর দাবী জানান।

চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি কর্মসূচি বাধা প্রদান: পার্বত্য চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি ও বিভিন্ন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজিত কর্মসূচি কতিপয় অঞ্চলে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বাধা দেয়া হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বান্দরবানের রাজার মাঠে নাগরিক সমাজের আহুত গণসমাবেশের অনুমতি প্রদান করেনি বান্দরবান জেলা প্রশাসন। গত ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৬ খাগড়াছড়ি জেলার সিন্দুকছড়ি সাব-জোনের সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টানানো পোস্টার ছেড়ে ফেলে এবং পোস্টারিং-এর কাজে নিয়োজিত কর্মীদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে আটকে রাখে। অন্যদিকে বান্দরবান জেলা সদরে চুক্তির ১৯তম বর্ষপূতি উদযাপন কমিটির শোভাযাত্রায় অংশ নিতে আসা লোকজনকে জেলা শহরের প্রবেশমুখ কালাঘাটায় বাধা দেওয়া হয়েছে। তল্লাশির কথা বলে সেখানে বেশ কয়েকটি গাড়িও আটকে রাখা হয়। এসব কারণে শত শত লোক চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি।

২২ পৃষ্ঠার পর

গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী

যুগ্ম-আহ্বায়ক দুলাল মাহাতো, দপ্তর সম্পাদক আপেল মুন্ডা, সদস্য তরুণ কুমার মুন্ডা, প্রভাতী বাস্কে, মলি বিশ্বাস।

সভায় বক্তার আদিবাসীদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও দর্শনকে ধারণ করে আদিবাসীদের লড়াই-সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম: ১০ নভেম্বর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের বাড়েল রোডস্থ ট্রাইবাল হোস্টেলে এম এন লারমার ভাস্কর্যের পাদদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

১১পৃষ্ঠার পর

গোয়েবলসীয় অপপ্রচার ও তথ্যসন্ত্রাস

আবাসভূমির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে চেয়ারম্যান- মেম্বার হওয়া সহ ক্ষমতা ও পদবী লাভ, প্রকল্প-চাকরি-টেণ্ডার লাভের সুযোগ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে কাঁচা টাকা কামাই, বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ে তোলার কায়েমী স্বার্থে জুম্মদের এই দুলাগোষ্ঠী মুৎসুদ্দীপনায় লিপ্ত রয়েছে।

এই অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও তথ্য সন্ত্রাসের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অধিকতর অবনতির দিকে যেমনি ধাবিত হচ্ছে তেমনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়ে ও অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আখেরে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল সাময়িক লাভবান ও পরিতৃপ্ত হলেও তারা দেশে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে চরম ক্ষতি করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নতুন করে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দশদফার ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা

৩০ নভেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরার সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বক্তব্য প্রদান করেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী রূপম। সংবাদ সম্মেলনে পঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বক্তব্য নিম্নে মুদ্রিত হলো-

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

৩০ নভেম্বর ২০১৬, বুধবার, সকাল ১১টা, হোটেল সুন্দরবন, ঢাকা

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা জানেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। দীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। সুদীর্ঘ ১৯ বছরের মধ্যে চারটি রাজনৈতিক সরকার ও দুইটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার- মোট ছয়টি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলেও কোন সরকারই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত জুম্ম জনগণ বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে অধিকতর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাধীনসত্তা ও স্বকীয় শাসনব্যবস্থা নিয়ে বসবাস করতো। পরবর্তীতে এ অঞ্চলটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে গেলেও প্রকৃতপক্ষে একটা সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থা তথা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে ঘোষণা করার পর এই এলাকার শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হলেও বস্তুত জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অনেক জেলার মতো ১৮৭৪ সালের তফসিলভুক্ত জেলা আইন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকেও তফসিল জেলা ঘোষণা করে জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয় - যা পরবর্তীতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা হয়। উক্ত শাসনবিধিতে বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনানুমতিতে প্রবেশ ও স্থায়ী বসতিস্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তীতে ১৯১৯ সাল ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যান্য অনেক অঞ্চলের ন্যায় 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। পাকিস্তান শাসনামলেও ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭-এ বর্ণিত আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ ছিল ও ১৯৬২ সালে উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের ফলে জুম্ম জনগণের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠে। সরকারি প্রশাসনের অবিচার ও নিপীড়ন এবং বহিরাগত ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যমূলক চরম শোষণ, সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপন ও ভূমি জবরদখলের প্রেক্ষিতে জুম্মদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে এই নিপীড়নের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। সঙ্গত কারণে মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, জাতীয়

পরিচিতি এবং পৃথক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারের নিকট আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। কিন্তু জুম্ম জনগণের প্রবল দাবি সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোন কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের নাগরিকরা বাঙালি বলে অভিহিত হবেন মর্মে সাংবিধানিক বিধান গ্রহণের মাধ্যমে ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী জুম্ম জাতিসমূহকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা হয়, যা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। অপরদিকে জুম্ম জনগণের দাবি পূরণের পরিবর্তে সরকার একের পর এক দমন নীতি গ্রহণ করতে থাকে। তদুদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে দীঘিনালা, আলিকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে জুম্ম জনগণের উপর সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর অভিযান ও নির্যাতন জোরদার হয়ে উঠে। অতঃপর জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সাল হতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার হীনউদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে সরকারি পরিকল্পনাধীনে সমতল জেলাগুলো থেকে পাঁচ লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জায়গা-জমির উপর বসতি প্রদান করা হয়।

সশস্ত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখে। এ প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমানের সরকার শান্তি আলোচনার জন্য সীমিত উদ্যোগ হাতে নেয়। পরে ১৯৮৫ সালের ২৫শে অক্টোবর হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানে ঐক্যমত্য হয়। জেনারেল এরশাদ সরকারের (১৯৮৩-১৯৯০) সাথে ৬ বার, বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) সাথে ১৩ বার এবং শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সাথে ৭ বার অর্থাৎ মোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান প্রদান করা। তদুদ্দেশ্যে চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, জুম্ম জনগণের জাতিগত অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশ করা, বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান ও ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি করা, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার বিধান করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৩ বছর ৮ মাস সময়ের মধ্যে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়নসহ কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, টাস্ক ফোর্স গঠন ও ভারত থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, ৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার (১৯৯৭-২০০১) শুধু চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে যায়নি, পাশাপাশি চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করা হয়। যার বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে।
- ১৯ জুলাই ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে সেটেলার বাঙালিদেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকরা স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন মর্মে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক অফিসাদেশ জারি করা হয়।
- আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি করে ১৭ জুলাই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়, যেখানে চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এছাড়া তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা জুম্মদের উপর বাঘাইহাট, বাবুছড়া, বোয়ালখালী- মেরুং ও রামগড়ে ৪টি সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। কিন্তু এসব হামলায় দায়ী কাউকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্তকরণ; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট বলেছিল যে, তারা ক্ষমতায় আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল করবে। তবে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল করেনি। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে 'জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়' রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করে। তবে চুক্তি বাতিল না করলেও চার দলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নানাভাবে ক্ষুণ্ন করে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জুম্মদের মধ্য হতে মন্ত্রী নিয়োগ না করে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে নিয়োগ না করে একজন বহিরাগত অউপজাতীয়কে নিযুক্ত করা এবং জুম্ম স্বার্থ বিরোধী উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন না করে তৎকালীন এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন করে কালক্ষেপণ করা হয়।
- নতুন ২৮,০০০ সেটেলার বাঙালি পরিবারকে রেশন প্রদান ও ১০,০০০ বহিরাগত বাঙালি পরিবারকে সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র করা হয়।
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা দিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' নামে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা জোরদার করা হয়।
- প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের স্থায়ী বসতি প্রদান করা ও তাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সর্বোপরি চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহিরাগত মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুক্ষ্ম পরিকল্পনাধীনে বহিরাগত বাঙালি অনুপ্রবেশ ও বসতি প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে পূর্বের মতো ২০০৬ সালে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বান্দরবানের রাজভিলা, খাগড়াছড়ির ভূয়াছড়ি, মহালছড়ি ও মাইসছড়িতে ৪টি সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলাসহ জুম্মদের ভূমি জবরদখলের জন্য বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের মদদ দেয়া হয় এবং এলক্ষ্যে তাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

দেশের জাতীয় রাজনীতির এক সংঘাতময় অবস্থায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সারা দেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, অস্থিতিশীল ও নিরাপদহীন হয়ে উঠে। এ সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার সুযোগে জুম্ম জনগণের উপর ধর-পাকড়, জেল-জুলুম ও হয়রানি বৃদ্ধি পায়। এ সময় জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ-শতাধিক নেতা-কর্মীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় অভিযুক্ত করা হয় এবং অনেককে মিথ্যাভাবে সাজা দেয়া হয়। জুম্ম জনগণকে তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত অভিবাসীদের বসতি স্থাপনের কার্যক্রম জোরদার করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জাতীয় পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশংসনীয় সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও আগেকার রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চরম উপেক্ষা করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পদদলিত করে ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অস্থায়ী ও বহিরাগত বাঙালিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। শেখ হাসিনা সরকার ২০০৯ সাল থেকে আজ অবধি প্রায় ৮ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলেও চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কতিপয় বিষয় হস্তান্তর, ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন ইত্যাদি চুক্তির কতিপয় বিষয় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে এসব উদ্যোগে ছিল ধারাবাহিকতা এবং দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।

পক্ষান্তরে দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করতে সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে অসত্য বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। বস্তুত ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের এই দায়সারা উদ্যোগ, চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে গড়িমসি, চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অসত্য তথ্য প্রচার ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরকার জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে অনাগ্রহী। তাই সরকার

কেবল চুক্তি বাস্তবায়নে তালবাহানা নয়, সেই সাথে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করতে থাকে। চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম-স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র জোরদার করা হয়েছে।
- আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর নামে একপ্রকার সেনা শাসন ও কর্তৃত্ব জারি রেখে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে।
- জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণের পরিবর্তে ঠেগামুখে স্থল বন্দর স্থাপন, ঠেগামুখ-চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ সড়ক ও সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, বিজিবির বিওপি স্থাপন, কাচলং-সীতা পাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন ইত্যাদি তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদেরকে তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে অবহেলিত অবস্থায় রেখে শিক্ষা প্রসারের নামে তথা চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলছে।
- জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং উগ্র জাতীয়তবাদী শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে কমপক্ষে ১০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করা হয়েছে।
- জুম্মদের মধ্যে তাবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।
- জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে দলীয় সদস্যদের দিয়ে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং পার্বত্যবাসীর বিরোধীতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী পরিষদের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে একতরফাভাবে ২০১৪ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ও দলীয়করণের ধারা আরো জোরদার করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ হতে চলেছে। আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মর্যাদা চিরতরে ক্ষুন্ন করার পাঁয়তারা চলছে। ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ও নিরাপদহীন হয়ে উঠে। সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। অথচ ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিন বাহিনীর সম্মতিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। অপরদিকে সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে নির্বিচারে ধর-পাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ, জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলছে। গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সেনা-বিজিবি-পুলিশী অভিযানে বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ও বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের একজন সদস্যসহ জনসংহতি সমিতির ৩০ জন সদস্য-সমর্থক ও নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ৮৯ জনকে মারধর করা হয়েছে, ৫৮ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি করা হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতির তিনটি অফিসসহ ২৩টি ঘরবাড়ি তল্লাসী ও তছনছ করা হয়েছে।

আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহিরাগত মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক অত্যন্ত সুক্ষ্ম পরিকল্পনাধীনে বহিরাগত বাঙালিদের অনুপ্রবেশ ও বসতি প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে জনৈক বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ও সেনাশাসনের সুযোগে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সারাদেশের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলারদের মধ্যে ঘাঁটি গড়ে তুলছে।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জুম্মদের আবাসভূমি ও ধর্মীয় স্থানসহ রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমি বেদখল এবং স্বভূমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আইন মোতাবেক জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার নিশ্চিত না করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে, রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণার নামে, ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হর্টিকালচার ও রাবার চাষের নামে ইজারা প্রদান করে হাজার হাজার একর জুম্মদের সামাজিক মালিকানাধীন জুমভূমি ও মৌজাভূমি জবরদখল করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও ভূমি জবরদখলের কারণে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় আদিবাসী জুম্মরা তাদের ৩০টি গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাজেকে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন বা স্থাপনের জন্য ভূমি জবরদখলের কারণে রুইলুই-এর দুটি ত্রিপুরা গ্রামের ৬৫ পরিবার, বান্দরবানের সেপ্রু পাড়ার

(জীবননগর) ১২৯ ম্রো পরিবার, আলিকদম-থানচির ক্রাউডং পাহাড়ের (ডিম পাহাড়) দুই শতাধিক ম্রো পরিবার, বান্দরবানে বগা লেকের ৩১টি বম পরিবার গ্রামবাসী উচ্ছেদের মুখে রয়েছে এবং তাদের জীবনজীবিকা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসনের পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জনগণের জীবনধারার প্রতি সংবেদনশীল নন। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী। ফলত: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা বহুলাংশে সম্ভবপর হচ্ছে না। এ কারণেই এ যাবৎ আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যাবলী চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করা হলেও তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব পুরোদমে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় শাখাসংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে একশ্রেণির জুম্মদের প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী ভূমিকা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হলেও আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব এসব পরিষদগুলোকে দলীয়করণ ও দুর্নীতির আখড়ায় এবং শাসকগোষ্ঠীর দালালী ও সুবিধাবাদী সংস্থায় পরিণত করে অথর্ব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। সারাদেশে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ তথা সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পার্বত্যাঞ্চলে সেই জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে ব্যবহার করা হচ্ছে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে। চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে সেনা-বিজিবি-পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পার্বত্য জেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিক হয়রানি চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামীলীগের প্রত্যক্ষ মদদে আঞ্চলিক পরিষদের দুইজন সদস্য, উপজেলা পরিষদের দুইজন চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য এবং একজন মৌজা হেডম্যানসহ জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের ১৩০ জন সদস্য-সমর্থক ও নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, তিনজন সদস্যকে খুন এবং অন্তত দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে।

দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক সোচ্চার হলেও এসব দল ও সমাজ নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি। এযাবৎ আদিবাসী সংগঠনের উদ্যোগে আহুত কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশের মধ্যে এসব দল ও সংগঠনের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রয়েছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ যেভাবে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল সেভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে তাদেরকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যায়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্যবাসীরা, বিশেষত: জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত এক চরম বাস্তবতায় মুখোমুখী হয়ে কঠিন জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণ এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বস্তুত: পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে রক্ত-পিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীর অধিকার সনদ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছে। দেশের শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি ও কালক্ষেপণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আবারও জটিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। বলাবাহুল্য, জুম্ম জনগণ তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে যে কোন বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে এবং তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ বরাবরের মতো সদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বার্ষিকীতে আবারো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ইত্যাদিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন করা; আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং স্থানীয় পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা; প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, যথাযথভাবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা ও সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পূর্ব-ঘোষিত দশদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে নেয়ার ঘোষণা করছে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য অঞ্চলে নদীগুলির ড্রেজিং এবং রামগড়ে স্থলবন্দর নির্মাণে অনুকূল মত ঠেগামুখ স্থলবন্দর নির্মাণে আঞ্চলিক পরিষদ বিরোধিতা করেছে

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নদীর সীমানা নির্ধারণ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং স্থলবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দুইজন সদস্যসহ পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রামের মং ও বোমাং সার্কেল চীফদ্বয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মাধব রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. কামালউদ্দিন তালুকদার, জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মো. আতাহ-ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তপন কুমার চক্রবর্তী ও বিআইডাব্লিটি-এর চেয়ারম্যান কমোডর এম মোজাম্মেল হকসহ নৌপরিবহন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

"পার্বত্য জেলা পরিষদে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নির্বাহী আদেশে হস্তান্তরিত ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঠেগামুখ-কোয়ার্পুচ্ছয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে কোন রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার" জন্য মতামত ও সুপারিশ পেশ করা হয়।

উক্ত সভায় চলাচল উপযোগী করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীগুলোকে খনন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে- কাচালং, মাইনি, ইছামতি, কর্ণফুলী, চেংগি, মাতামুহুরি, সাংগু, ফেনী ও হালদা। এ ছাড়া আরো কিছু শাখা নদী খনন করা হবে। তিন জেলাগুলোর নদীর সীমানা নির্ধারণ করা হবে। সীমানা নির্ধারণ করবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এরপর নদীগুলো খননের কাজ করবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। এর ফলে ওই এলাকার মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হবে, তেমনি তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বড় অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনজেলায় তিনটি স্থলবন্দর নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে খাগড়াছড়ির রামগড়ের সঙ্গে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের সঙ্গে মিয়ানমারের মংডু এবং রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ঠেগামুখের সঙ্গে ভারতের মিজোরামের কোয়ার্পুচ্ছয়ার মধ্যে স্থলবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব তুলে ধরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ির রামগড়ের সঙ্গে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের সঙ্গে মিয়ানমারের মংডু-এর মধ্যে স্থলবন্দর নির্মাণের পক্ষে অনুকূল মত দেয়া হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ঠেগামুখ-কোয়ার্পুচ্ছয়া স্থলবন্দর স্থাপন এবং ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার লিখিত সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত ও সুপারিশে বলা হয় যে, ঠেগামুখে স্থলবন্দর স্থাপন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হলে এর সুফল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়ি অধিবাসীগণও ভোগ করতে পারতেন। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা সুফল আনয়নের পরিবর্তে কুফলই বেশি পরিমাণে আনয়ন করতে পারে বলে আঞ্চলিক পরিষদ মত ব্যক্ত করেছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় বিশেষত স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রতিনিধিগণ উক্ত ধরনের মতামত তুলে ধরেন এবং ১২ জুন ২০১৬ তারিখে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি কর্তৃক "পার্বত্য জেলা পরিষদে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নির্বাহী আদেশে হস্তান্তরিত ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঠেগামুখ-কোয়ার্পুচ্ছয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে কোন রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার" জন্য মতামত ও সুপারিশ পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষার সময় উল্লিখিত রিওজিনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-এর আওতায় ঠেগামুখ স্থলবন্দর নির্মাণ ও ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কে দুই বিপরীতমুখী মতামত বা সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত বিষয়ের সমীক্ষায় সম্পৃক্ত সংস্থা বিশ্বব্যাংক বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ এবং আলোচনার প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় নিয়ে ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে লিখিত একটি পত্রে ঠেগামুখ-চট্টগ্রাম সংযোগ সড়ক সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম বিষয়ে কোন কাজ করবে না বলে বিশ্বব্যাঙ্ক মতামত জ্ঞাপন করেছে।

উক্ত সভায় কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক

পরিষদ মতামত ও সুপারিশ দিয়েছে যে, কাপ্তাই হ্রদের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতায় এর আয়তন ৩০০ হতে ৪০০ বর্গ মাইল হয়ে থাকে। এ হ্রদের অন্যতম চাষ হলো মৎস্য চাষ ও জলেভাসা জমি চাষ। জলেভাসা জমিতে চাষের জন্য পানির উচ্চতা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবৎ তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় জলেভাসা জমি চাষের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রায়ই বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। এ যাবৎ চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা কমিটি পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লিখিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণসহ কাপ্তাই হ্রদ যথাযথভাবে পরিচালনার্থে পদাধিকার বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাব আজ অবধি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যায়ের সর্বোচ্চ সংস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত বিধানাবলীর আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। সুতরাং কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে পদাধিকার বলে সভাপতি করে পুনর্গঠন করা আবশ্যক।

আরো উল্লেখ্য যে, আইন অনুযায়ী পার্বত্য জেলার পানি সম্পদ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কাপ্তাই হ্রদ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি পদে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের পরিবর্তে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানকে পদাধিকার বলে নিয়োগ করা বিধিসম্মত হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নদীর সীমানা নির্ধারণ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং স্থলবন্দর নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ হতে মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয় যে-

১. কাপ্তাই হ্রদে নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে চলমান প্রকল্প (ড্রেজিং) চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে আইন অনুযায়ী সম্পৃক্ত থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

২. রামগড় হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত স্থলপথ চালু রয়েছে বিধায় রামগড়-সাব্রুম স্থলবন্দর চালু করার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে স্থাপিত বা কার্যকর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ঠেগামুখ-কোয়ার্পুছড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং ঠেগামুখ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে কোন রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা।

৪. পানিসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলী যাতে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ কর্তৃক পরিচালনা, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন এবং পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদন করা যায় তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা কমিটি ও কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে পদাধিকার বলে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করে পুনর্গঠন করা।

বিশেষ প্রতিবেদন

ভূষণছড়া ইউপি নির্বাচনে স্থানীয় বিজিবির সহায়তায় নজীরবিহীন ভোটডাকাতির অভিযোগ এবং জনগণের ব্যাপক আন্দোলন ও পুনর্নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করে

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অবৈধভাবে ভূষণছড়া ইউপির আ'লীগের প্রার্থীকে চেয়ারম্যান ঘোষণা

ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর ঘোষণা করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কমিটি গঠনের দাবি জনগণের

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ছোট হরিণা কেন্দ্রে স্থানীয় বিজিবি ও প্রশাসনের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও তাদের দলীয় প্রার্থী কর্তৃক কেন্দ্র দখল করে নজীরবিহীন ভোটডাকাতির অভিযোগ, উক্ত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দাখিল ও হাইকোর্টে মামলার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি অবৈধ ও একতরফাভাবে নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত আওয়ামীলীগ প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনকে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে এবং রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার তড়িঘড়ি করে চুপিসারে মামুনকে চেয়ারম্যান হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। এদিকে উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা সভায় মামুনুর রশিদ মামুনের উপস্থিতির বৈধতার প্রশ্ন তুলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেলে উপজেলার অন্যান্য ইউপি চেয়ারম্যানরা প্রতিবাদে আইন-শৃঙ্খলা সভা বর্জন করেছেন। অপরদিকে ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর ঘোষণা করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কমিটি গঠন করে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাবি জানিয়েছেন ইউনিয়নের হেডম্যান, কার্বারী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বলাবাহুল্য, ব্যাপক ভোট জালিয়াতির অভিযোগ, বিতর্কিত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি, উচ্চ আদালতে এ বিষয়ে মামলা বহাল থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এভাবে একতরফা ও অস্বচ্ছ পদক্ষেপের ফলে সরকার, নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভূমিকা নিয়ে নিঃসন্দেহে ব্যাপক প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। বস্তুত পার্বত্য এলাকায় সরকার, সরকারি প্রশাসন ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ নিয়ে যে জুম্ম বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ হরহামেশা শোনা যায় ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের সর্বশেষ গৃহীত পদক্ষেপে তা যেন আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬ এর অংশ হিসেবে গত ৪ জুন ২০১৬ ষষ্ঠ তথা শেষ ধাপে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন ইউনিয়নসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি জেলায় অনুষ্ঠিত ৪৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলেও কতিপয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে কর্তব্যরত নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায়

স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও তাদের প্রার্থী বহিরাগত লোক দিয়ে সশস্ত্রভাবে জোরপূর্বক কেন্দ্র দখল করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, ভোটারদের উপর হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাড়িয়ে দেয়াসহ নির্বাচন আচরণবিধি লংঘনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জালভোট প্রদান ও ভোট জালিয়াতি করে।

বিশেষ করে বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তৎসংলগ্ন হরিণা জোনের ২৫ বিজিবির সহায়তায় আওয়ামীলীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের সমর্থকরা কেন্দ্র দখল করে ব্যাপক জালভোট প্রদান করে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের পুর্ব মুহূর্তে সকাল প্রায় ৮:০০ টার আগে থেকে হরিণা জোনের জোন কম্যান্ডার লে. কর্ণেল শাহাবুদ্দিন ফেরদৌসের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা ভোট কেন্দ্রের অনতিদূরে চেকপোস্ট বসিয়ে পাহাড়ি ভোটারদের আইডি চেক করার নামে হয়রানি করে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধার সৃষ্টি করে। সকাল আনুমানিক ১১:০০ টার দিকে আওয়ামীলীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের প্রায় ৫০/৬০ জনের একদল বহিরাগত ক্যাডার বিজিবি সদস্যদের সহায়তায় ছোট হরিণা ভোটকেন্দ্রটি দখল করে ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমার পোলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক কেন্দ্র থেকে বের করে এবং লাইনে দাঁড়ানো পাহাড়ি নারী-পুরুষ ভোটারসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের উপর এলোপাতাড়িভাবে হামলা করে। এতে অন্তত ১৯ জন পাহাড়ি ভোটার আহত হয়। এসময় আওয়ামীলীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনের ক্যাডাররা প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের সহায়তায় কয়েক ঘন্টা ধরে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ব্যাপকভাবে জালভোট প্রদান করে। প্রায় দুই তৃতীয়াংশের অধিক পাহাড়ি ভোটার অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে পাহাড়ি ভোটাররা ভোট দিতে না পারলেও ভোটকেন্দ্রে প্রায় শতভাগ ভোট কাস্ট দেখানো হয়েছে।

এরপর নির্বাচনের পরদিন ৫ জুন ২০১৬ থেকেই উক্ত ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে এলাকার জনসাধারণ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদানসহ হাট-বাজার বর্জন এবং সড়ক ও জলপথ অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ ও পালন করা হয়। আন্দোলনের পাশাপাশি ৮ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমা সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এ্যাড. মোঃ ইদ্রিসুর রহমানের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত ও উক্ত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশনাসহ ন্যায়বিচার চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবের বরাবরে উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। এছাড়া ৯ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমা আবারও লিখিতভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে উক্ত ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। এরপর ১২ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমার পক্ষে এ্যাড. মোঃ ইদ্রিসুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন। উক্ত রিট পিটিশনের ভিত্তিতে গত ১৬ জুন ২০১৬ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে দীলিপ কুমার চাকমার আবেদনের বিষয়ে মীমাংসা করার পরামর্শ দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করে। হাইকোর্টের এই নির্দেশনার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন মোঃ আব্দুল বাতেন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত তদন্ত কমিটি ২৬ জুন ২০১৬ বরকল উপজেলা সদরে গিয়ে দিনব্যাপী তদন্ত কাজ চালায়। তদন্ত কাজের স্বার্থে এলাকার জনসাধারণ ও জনসংহতি সমিতি হাট-বাজার বর্জন ও সড়ক-জলপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত তদন্ত কমিটি তার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। এমনকি চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা নির্বাচন কমিশনের বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির আবেদন জানালেও তিনি কোন সদুত্তর পাননি।

তবে ১৬ জুলাই ২০১৬ অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ঘোষিত চেয়ারম্যান-মেম্বারগণের সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হলেও ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। এতে নির্বাচন কমিশন ও তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভূমিকা নিয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়।

কিন্তু উচ্চ আদালতের মামলা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ পূর্বক স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ নির্বাচন কমিশন উক্ত ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারদের গেজেট প্রকাশ করলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এভাবে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে গেজেট প্রকাশের পর গত ২৮ নভেম্বর ২০১৬ উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা সুমনী আক্তার উক্ত মেম্বারদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে ইউনিয়নের ৫ জন মেম্বার শপথ গ্রহণ করলেও সংখ্যাগরিষ্ট বাকি ৭ জন মেম্বার ওই শপথ গ্রহণ প্রত্যাখান করেন। এরপর ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ নির্বাচন কমিশন একই কায়দায় জনগণের ব্যাপক ভোট জালিয়াতির অভিযোগ, তদন্ত কমিটির ফলাফল, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও স্বচ্ছতাকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে মামুনুর রশিদ মামুনের নামে গেজেট প্রকাশ করেন। আর জেলা প্রশাসক কোন কিছু বাছবিচার না করে অনেকটা তাড়াহুড়ো করে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ মামুনুর রশিদ মামুনকে ডেকে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং বৈধ চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা দেন। নির্বাচন কমিশন ও জেলা প্রশাসনের সর্বশেষ এই অস্বচ্ছ ও পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকায় জনমনে সৃষ্টি হয়েছে গভীর আস্থাহীনতা, হতাশা ও ক্ষোভ। ভূষণছড়ার মত প্রত্যন্ত একটি ইউনিয়নের একটি মাত্র কেন্দ্র নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন যে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে পারে না তাতে এই রাষ্ট্র ও সমাজের গভীর অসুস্থতাকেই ফুটিয়ে তোলে। এটি সরকারি দল ও প্রশাসনের 'বিচার মানি কিন্তু তাল গাছ আমার' এই নীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এদিকে গত ৯ জানুয়ারি ২০১৬ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমনী আক্তার কর্তৃক আহুত উপজেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভায় বিতর্কিত চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ মামুন উপস্থিত হলে উপজেলার অন্যান্য ৪ ইউপি চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ মামুনের চেয়ারম্যান হিসেবে ঐ সভায় উপস্থিতি নিয়ে বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট বৈধতার প্রশ্নে যুক্তি দেখান যে, 'ইউনয়ন পরিষদ আইন অনুযায়ী শপথ নেয়ার পর প্রথম সভা করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং পরিষদের দিন গণনা শুরু হবে। মামুনুর রশিদ মামুন শপথ নিয়েছেন কিন্তু পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে প্রথম সভা করেননি।' তাঁরা আরো উল্লেখ করেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২৯ নং ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষে নির্বাচনের পর এর তিন-চতুর্থাংশ সদস্য শপথ গ্রহণ করলে ইউনিয়ন পরিষদটি যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু ঐ ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ট মেম্বার ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার ৭ জনই শপথ গ্রহণ করেনি। তাই আইন অনুযায়ী ঐ ইউনিয়ন পরিষদটি পুর্ণাঙ্গ পরিষদে পরিণত হয়নি। কাজেই ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ মামুন আইন অনুযায়ী বৈধ নন।' তাহলে কেন মামুনুর রশিদ মামুন চেয়ারম্যান হিসেবে এই সভায় উপস্থিত থাকবেন? এই প্রশ্নের জবাবে নির্বাহী কর্মকর্তা কোন সদুত্তর দিতে না পারলে এর প্রতিবাদে উক্ত ৪ ইউপি চেয়ারম্যান ঐ দিনের আইন-শৃঙ্খলা সভা থেকে ওয়াক-আউট করেন।

অপরদিকে সর্বশেষ গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর ঘোষণা করে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রশাসনিক কমিটি গঠন করে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাবি জানিয়ে ইউনিয়নের ১২৬ জন হেডম্যান, কার্বারী ও এলাকার জনসাধারণ স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা সুমনী আক্তারের কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু আজ অবধি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বিশেষ প্রতিবেদন

রোয়াংছড়িতে এক অপহরণকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী ও জেএসএস সদস্যদের উপর সেনা-পুলিশের নিপীড়ন-নির্যাতন

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং ইউনিয়নের বাঘমারার ভিতরপাড়ার কার্বারী (গ্রামপ্রধান) মংশৈথুই কার্বারীকে অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেঃ কর্ণেল মশিউর রহমানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর রোয়াংছড়ি সাব-জোন (১৯ বেঙ্গল) কর্তৃক এলাকায় সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে জুম্মদের গ্রামে বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার, ছয়জনকে মারধর এবং ১০ জনকে ক্যাম্পে নিয়ে নানাভাবে হয়রানি করেছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর মতে, মংশৈথুই কার্বারীকে অপহরণের ঘটনা সাজানো এবং পূর্ব পরিকল্পিত। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে ও অপারেশন উত্তরণসহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে চলমান আন্দোলন-সমর্থনকারী জুম্ম গ্রামবাসী এবং আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মীদেরকে নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো, সর্বোপরি এলাকার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীনউদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বের যোগসাজশে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সাধারণ জুম্মদের উপর এ নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করেছে।

জানা যায় যে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাতে আনুমানিক ৯:০০ টার দিকে নোয়াপতং ইউনিয়নের বাঘমারা ভিতর পাড়ার কার্বারী মংশৈথুই কার্বারীকে তাঁর বাসা থেকে ডেকে নিয়ে কে বা কারা অপহরণ করে। অপহরণের সময় বাথোয়াই মারমা নামে বাঘমারা ভিতর পাড়ার একপ্রতিবেশী তাঁকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যান। ডেকে নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ৯ জনের একদল লোক তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অপহরণকারীদের মধ্যে চারজন মুখোশ পরিহিত ছিল বলে জানা যায়।

কিন্তু অশ্চর্যের বিষয় যে, যিনি মংশৈথুই কার্বারীকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন সেই বাথোয়াই মারমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে অপহরণের অব্যবহিত পরই রাত আনুমানিক ২:৩০ ঘটিকায় তাৎক্ষণিকভাবে কোন অভিযোগ ছাড়াই জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কমিটির সদস্য ও নোয়াপতং ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং নোয়াপতং ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার ক্যনু প্রু মারমাকে তাঁর নাছালং পাড়ার বাড়ি থেকে এবং দৈনিক মুক্তবাণীর স্থানীয় সংবাদদাতা থোয়াইচিং উ মারমাকে মুরুংক্ষ্যংমুখ পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে অপহৃত মংশৈথুই কার্বারীর স্ত্রী খ্যইয়নু মারমা (৩১) বাদি হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বান্দরবান সদর থানায় বাঘমারা ভিতরপাড়ার বাসিন্দা বাথোয়াই মারমা (৩৮) পিতা ক্যশৈউ মারমা এবং নোয়াপতং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও দোছড়ি গ্রামের বাসিন্দা উবাসিং মারমা (৪২) পিতা থোয়াই শৈ প্রু মারমার বিরুদ্ধে এক অপহরণ মামলা দায়ের করেন।

মংশৈথুই কার্বারীর অপহরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এজাহারভুক্ত আসামী ধরার নামে ৫ ফেব্রুয়ারি রাত ৯:৩০ ঘটিকায় বাঘমারা ক্যাম্পের সেনারা রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং ইউনিয়নের দোছড়ি পাড়ায় তল্লাসী অভিযান চালায় এবং গ্রামবাসীদেরকে দোছড়ি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জড়ো করে তাদের মধ্যে ছয়জন গ্রামবাসীকে বেদম মারধর করে। নির্যাযনের শিকার ছয় গ্রামবাসী হলো- সিংথোয়াই অং মারমা (৩০), মংনু মারমা (৩৬), উক্যামং মারমা (৩৫), ক্যসিং মারমা (২৭), মংচিনু মারমা (৪০) ও উচথুই মারমা (৩৮)। উক্ত অভিযানের সময় এজাহারভুক্ত ২নং আসামী নোয়াপতং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য উবাসিং মারমাকে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে সেনা সদস্যরা গ্রামবাসীদেরকে মারধর করে। তারপর দিন ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮:০০ টার দিকে উক্ত ছয়জনসহ মোট ১০ জন গ্রামবাসীকে আবারো বাঘমারা সেনা ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায়। নির্যাতনের শিকার উক্ত ছয়জন ছাড়া আরো চারজন গ্রামবাসী হলো- ক্যছো মং মারমা (৪৪), থুইসাচিং মারমা (৪০), থোয়াইশৈপ্রু মারমা (৭০) ও মিসেস মেইথুই প্রু মামরা (৩৮)। নানা হয়রানি ও অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদের পর দুপুর ১২:০০ টার দিকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ দোছড়ি গ্রামের কার্বারী থোয়াইশৈপ্রু মারমা (৭০) পিতা মৃত চাইসা প্রু মারমা এবং বাঘমারার ভিতরপাড়ার নিবাসী মংগুলী মারমা (৭০) পিতা আমং মারমাকে বাঘমারা ক্যাম্পে ডেকে নেয়া হয় এবং উবাসিং মারমাকে খোঁজে দিতে না পারলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। তদনুসারে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রাত ১:০০ টায় রোয়াংছড়ি থানা পুলিশ তাদের দুইজনকে গ্রেফতার করে। উল্লেখিত গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউই এজাহারভুক্ত আসামী না হলেও আসামী খোঁজার নামে সেনাবাহিনী তাদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন করে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মংশৈই থুই কার্বারী কর্তৃক রোয়াংছড়ি থানায় উল্লেখিত দুই দফায় ধৃত চারজনসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলার এজাহারে অভিযুক্ত ব্যক্তির হলেন- নুশৈপ্রু মারমা, উবাসিং মেম্বার (৪১), থোয়াইশৈ প্রু মারমা (৭০), মংগুনি মারমা (৬৭), ক্যনু প্রু মারমা (৩৮), থোয়াইচিং উ মারমা (৫৩), সানু প্রু মারমা (৪২), মংনু মারমা (৩৪) ও হ্লানুচিং মারমা (৩৫) প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকালে অপহৃত মংশৈথুই কার্বারী অপহরণকারীদের ঘায়েল করে অপহরণের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বেতছড়া ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। অপহরণকারীরা নিরস্ত্র লুঙ্গিপরা চারজন মারমা ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রচার করা হয় যে, তারাই অপহৃত মংশৈথুই কার্বারীকে উদ্ধার করেছে। অপহরণের কবল থেকে ফিরে আসার পর মংশৈথুই কার্বারীকে বান্দরবান সেনা জোনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, অপহৃতের স্ত্রী খ্যইয়নু মারমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার ১নং আসামী বাথোয়াই মারমাকে অপহরণ ঘটনার পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি বান্দরবান জোনে নিয়ে সেনা হেফাজতে রাখা হয়। তারপর দিন ৫ ফেব্রুয়ারি অপহরণের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আসা মংশৈ থুই কার্বারীর সাথে বাথোয়াই মারমাকেও সেনা হেফাজত থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এজাহারভুক্ত ১নং আসামীকে ছেড়ে দেয়া হলেও গ্রেফতারকৃত অপর দুইজন ব্যক্তি ক্যনু প্রু মারমা ও থোয়াইচিং উ মারমাকে পুলিশ রিমাণ্ডে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে ৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা চাইসিংমং (২৬) পিতা মংনি মারমা নামে রোয়াংছড়ির তারাসা ইউনিয়নের লতাঝিড়ি গ্রামের এক বাসিন্দাকে মারধর করে। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯:০০ টায় তারাসা ইউনিয়নের লতাঝিরি থেকে পুথুইচিং মারমা (৪৫) ও নিথুইঅং মারমা (৪৫) পিতা মৃত শৈথুইঅং মারমা নামে দুইজন গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী ও তালুকদার পাড়া সন্ত্রাস দমন গ্রুপ বেতছড়া ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে ক্যাম্পে দুইদিন ধরে নির্যাতনের পর ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১:০০ টায় রোয়াংছড়ি সদরের নোয়াপাড়ায় রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের সেনারা এক তল্লাসী অভিযান চালায়। সেসময় তারা বানুচিং মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১০ টার দিকে বান্দরবানের একদল সেনা নোয়াপতং ইউনিয়নের আন্তাহা পাড়ায় তল্লাসী চালায়। গ্রামের দুর্পজয় ত্রিপুরা ও জয়চন্দ্র ত্রিপুরার কাছ থেকে এলাকায় জনসংহতি সমিতির সদস্য আছে, তারা কোথা থেকে অর্থ পেয়ে থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করে হয়রানি করে।

বাথোয়াই মারমাকে গ্রেফতার না করে ছেড়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতো ভাড়াটে লোক দিয়ে এই অপহরণ ঘটনার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে তৎকালীন ডানিডা প্রকল্প ম্যানেজার হোসেন শহীদ সুমনকে অপহরণ, ২০১৫ সালে ট্যুরিষ্ট গাইডসহ দুইজন পর্যটককে অপহরণসহ অনেক ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়। পরে প্রমাণিত হয় জনসংহতি সমিতি উক্ত কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না।

আরো উল্লেখ্য যে, অপহৃতের স্ত্রী খ্যইয়নু মারমার দায়েরকৃত মামলায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে উল্লেখ করা হয় যে, "বাথোয়াই মারমা ও উবাসিং মারমা জেএসএস-এর লোক। জেএসএস/ পিসিপি-পর লোকজন অস্ত্রধারী পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের (ভিতর পাড়া) সহায়তায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ চাঁদাবাজি করে থাকে। আমার স্বামী উক্ত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই কারণে বাথোয়াই মারমা ও উবাচিং মেম্বার এলাকার অন্যান্য জেএসএস/পিসিপির নেতাদের পরিকল্পনা ও পরস্পর যোগসাজশে সশস্ত্র উপজাতি সন্ত্রাসীদের দ্বারা আমার স্বামীকে খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ করা হয়েছে বলে আমার ও এলাকাবাসীর ধারণা।"

বলাবাহুল্য, খ্যইয়নু মারমার উক্ত অভিযোগ সেনাবাহিনী বা পুলিশ বা ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের শেখানো বুলি বলে বিবেচনা করা যায়। উবাসিং মারমা একজন নির্বাচিত ইউপি সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সদস্য হলেও বাথোয়াই মারমা জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত নয়। দায়েরকৃত মামলার এজাহারভুক্ত ১নং আসামী আরো উল্লেখ্য যে, অপহৃতের স্ত্রী খ্যইয়নু মারমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার ১নং আসামী বাথোয়াই মারমাকে অপহরণ ঘটনার পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি বান্দরবান জোনে নিয়ে সেনা হেফাজতে রাখা হয়। তারপর দিন ৫ ফেব্রুয়ারি অপহরণের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আসা মংশৈ থুই কার্বারীর সাথে বাথোয়াই মারমাকেও সেনা হেফাজত থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এজাহারভুক্ত ১নং আসামীকে ছেড়ে দেয়া হলেও গ্রেফতারকৃত অপর দুইজন ব্যক্তি ক্যনু প্রু মারমা ও থোয়াইচিং উ মারমাকে পুলিশ রিমাণ্ডে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাথোয়াই মারমাকে গ্রেফতার না করে ছেড়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতো ভাড়াটে লোক দিয়ে এই অপহরণ ঘটনার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে তৎকালীন ডানিডা প্রকল্প ম্যানেজার হোসেন শহীদ সুমনকে অপহরণ, ২০১৫ সালে ট্যুরিষ্ট গাইডসহ দুইজন পর্যটককে অপহরণসহ অনেক ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়। পরে প্রমাণিত হয় জনসংহতি সমিতি উক্ত কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না।

উল্লেখ্য যে, বান্দরবান জেলার রাজভিলা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা মংপু মারমাকে ২০১৬ সালের জুন মাসে কে বা কারা অপহরণ করে এবং অপহরণের পর পরই রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে উক্ত অপহরণের সাথে জড়িত করে বান্দরবানের জনসংহতি সমিতির ৩৮ জন সদস্যের বিরুদ্ধে এবং তৎপরিবর্তী সময়ে চাঁদাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির প্রায় শ' খানেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বান্দরবান জেলায় কমপক্ষে ৩০ জনকে গ্রেফতার ও দেড় শতাধিক লোককে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জনৈক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন কর্তৃক চাঁদাবাজি, গাড়ি ভাঙচুর ও এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের ১৯ জন সদস্যের বিরুদ্ধে বান্দরবান থানায় দায়েরকৃত মামলা মোহাম্মদ আবু হানিফের দ্রুত বিচার আদালতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে খারিজ হয়ে যায়।

মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও সেনা নিপীড়ন-নির্যাতনের

৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে নির্বিচারে ও অবৈধভাবে খাল, ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে পাথর উত্তোলন ব্যাপক হুমকির মুখে এলাকার জলাধার, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

বান্দরবানে দীর্ঘদিন ধরে নির্বিচারে ও অবৈধভাবে বিভিন্ন খাল, ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে এলাকার প্রাকৃতিক জলাধার, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপক হুমকির মুখে পড়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক জলাধার ধ্বংস হওয়ায় ও ব্যাপক পাথর উত্তোলনের ফলে স্থানীয় জুম্ম জনগোষ্ঠী মারাত্মক পানীয় সংকটেরও সম্মুখীন হচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক কালে এই পাথর উত্তোলনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে মূলত বহিরাগত কিছু ব্যবসায়ী ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের পাথর ব্যবসা এবং অপরদিকে স্থানীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প এই পাথর উত্তোলনের জন্য দায়ী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হলে এবং এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হলে বিষয়টি মিডিয়াসহ অনেকের নজরে আসে। জানা গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে একটি সংঘবদ্ধ চক্র কর্তৃক রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি, লামা, আলীকদম ও সদর উপজেলায় এই পাথর উত্তোলনের মহোৎসব চলছে। বিভিন্ন ঠিকাদার বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে এই পাথর উত্তোলন করে থাকে।

স্থানীয় সূত্র বলছে, প্রায় দশ বছর ধরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার কিছু বহিরাগত ব্যবসায়ী বান্দরবান সদর উপজেলাধীন টংকাবতী ইউনিয়নের রুই খাল, টাক খাল, টাকের পানছড়ি ঝিরি, ডেন ঝিরি ও টংকাবতী খাল থেকে পাথর উত্তোলন করে চলেছেন। অপরদিকে রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং, লামা উপজেলার লাইন ঝিরি, কাঁকড়া ঝিরি, হরিণ ঝিরি, টাকের পানছড়ি ঝিরি, শীলের তোয়া, কাঁঠাল ছড়া, নন্দীর বিল, ফাসিয়াখালি; থানচি ও আলীকদম উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝিরি ও পাহাড় খুঁড়ে বারুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর উত্তোলন করছে পাচারকারীরা। সম্প্রতি রুমা উপজেলার রুমা খাল, চেমা খাল, বগা খাল, পলি খাল, পাইন্দু খাল, খেমাগ্রী খাল ইত্যাদি স্থান থেকে নির্বিচারে পাথর উত্তোলন অধিকতর জোরদার করা হয়। জানা গেছে, সেনাবাহিনীর ১৯ ইসিবি কর্তৃক রুমা উপজেলা সদরের থানা পাড়া থেকে বগালেক-কেউক্রাডং পাহাড় পর্যন্ত একটি পাকা সড়ক নির্মাণকরা হচ্ছে। সেখানেই এই সমস্ত খাল থেকে উত্তোলিত পাথর-বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য স্থানীয় সেনাবাহিনী সম্প্রতি এলাকার মুরুব্বীদের ডেকে এলাকা থেকে পাথর-বা ি ল উত্তোলনে সহযোগিতা চেয়েছে বলেও জানা গেছে। রুমা খালের পাথর উত্তোলনকারীদের মধ্যে রুমা উপজেলার বাসিন্দা উজ্জল ধর, দোহাজারীর অধিবাসী শঙ্কর গুপ্ত, কেরানিহাট থেকে সাবের সওদাগর ও খাগড়াছড়ির দিঘীনালা থেকে মোঃ হারেজ মিয়ার নাম জানা গেছে। পাথর বিক্রেতাদের মধ্যে রুমা উপজেলার ৩৫৬নং পলি মৌজার হেডম্যান চিংসাঅং মারমা এবং ৩৫৮নং রুমা মৌজার হেডম্যান বাথোয়াইঅং মারমা প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম পাওয়া গেছে । এদিকে দীর্ঘ দিন ধরে খাল, ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে নির্বিচারে ও ব্যাপক হারে পাথর-বালি উত্তোলনের ফলে প্রাকৃতিক জলাধারসমূহ ধ্বংসের মুখে পড়ে খাল, ঝিরি ও ঝর্ণার পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন এলাকাবাসী মারাত্মক পানীয় সংকটে পড়ছেন, অপরদিকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও উদ্ভিদ হুমকির মুখে পড়ছে।

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বহিরাগত পাথর ব্যবসায়ী প্রদীপ দাশ, আলী হোসেনসহ পাথর জেলা সদরের টংকাবতী ইউনিয়নে মকবুল উকিল, মোঃ কালু মেম্বার, আব্দুর রহিম; রোয়াংছড়ি উপজেলায় আবুল বশর ড্রাইভার, থানচি উপজেলার মংথোয়াই ম্যারনি; আলীকদম উপজেলায় আবুল কালাম; চট্টগ্রামের বাজালিয়া এলাকার জিয়া বছরের পর বছর ধরে পাথর উত্তোলনের সাথে জড়িত রয়েছে। এই পাথর উত্তোলনের পেছনে স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজস এবং ক্ষমতাসীন দলের এক শ্রেণির ঠিকাদারের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অবৈধভাবে এই পাথর উত্তোলনের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ টংকাবতী ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের ম্রো জনগোষ্ঠীর কয়েকশ গ্রামবাসী বান্দরবান জেলা সদরের প্রেসক্লাব এলাকায় এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। অপরদিকে এলাকায় নির্বিচারে পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে শিমুল জালাই ত্রিপুরা নামের এক ব্যক্তি চার সচিবসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবানের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে। এতে আদালত উক্ত ব্যক্তিদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছেন বলেও জানা গেছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বান্দরবান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৭টি উপজেলার খাল, ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটির হেচারি এলাকার ২৭ জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ষড়যন্ত্র

অতি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের নামে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরস্থ ১০২ নং রাঙ্গাপানি মৌজাধীন হেচারি এলাকার জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২৭ পরিবার জুম্মকে উক্ত এলাকা থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। জানা গেছে, এ সকল জুম্মরা ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে একবার এবং ১৯৯০ দশকের শুরুতে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে আরেকবার বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছেন। বর্তমানে এসকল পরিবারসমূহ উক্ত এলাকায় ২০-২৫ বছর ধরে বসবাস করে আসছেন।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকাল ১১:০০টা থেকে এক ঘন্টাব্যাপী রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের সামনে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের নামে রাঙ্গামাটি শহরের হেচারি এলাকার ২৭ জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অচিরেই বাতিলের দাবিতে হেচারি এলাকা ভূমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধন থেকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলার ডেপুটি কমিশনার, চাকমা সার্কেল চীফ ও রাঙ্গামাটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত দরখাস্তে বলা হয় যে, উক্ত হেচারি এলাকার তারা ২৭ পরিবার জুম্ম সকলেই ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তুর শিকার। ঐ সময় উদ্বাস্তু হওয়ার পর তারা স্ব স্ব ভূমি ছেড়ে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারা আবার উক্ত জায়গা-জমি থেকে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হন। ফলে ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে তারা এই পরিবারসমূহ উক্ত হেচারি এলাকায় বসবাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির বন্দোবস্তী বন্ধ থাকায় তারা তাদের এই বসতভূমি রেকর্ডভুক্ত করতে পারেননি। তবে শুরু থেকেই তারা সংশ্লিষ্ট ১০২নং রাঙাপানি মৌজার হেডম্যান চাকমা সার্কেলের চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের অনুমতি নিয়েই এই জায়গায় বসবাস করছেন। সেই আলোকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার আলোকে তারা অবশ্যই উক্ত জায়গা-জমির প্রকৃত ও বৈধ মালিক।

দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা, আইন, রীতি, প্রথা ও পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনাকে উপেক্ষা করে সরকারের পক্ষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক বন্দোবস্তী মামলা নং-০১(১৫)/২০১৬-১৭(১০২) মূলে উক্ত জায়গা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অনুকূলে বন্দোবস্তী প্রদানের প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। দরখাস্তে আরও উল্লেখ করা হয়, উক্ত ২৭ জুম্ম পরিবারের প্রায় সকলেই অনেক কষ্টে, মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের আর বসবাসের কোন বাস্তুভিটা নেই। বারবার উচ্ছেদ হওয়ার শিকার হয়ে তারা আজ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। চুক্তি ও আইন অনুযায়ী যেখানে তাদের মত অসহায় ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারসমূহকে পুনর্বাসন ও ভূমি বরাদ্দ দিয়ে ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার কথা সেখানে উল্টো তাদেরকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে, যা কোনভাবে মানবিক বলে বিবেচনা করা যায় না।

জানা গেছে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলা প্রশাসনের কানুনগোসহ একদল কর্মকর্তা-কর্মচারী একদল সেনা ও পুলিশ সদস্যসহ হেচারি এলাকায় গিয়ে এলাকাবাসীর অজান্তে বিনা নোটিশে একতরফা-ভাবে উক্ত ২৭ পরিবারের জায়গা পরিমাপ করেন এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য উক্ত জায়গা অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়ে দেন। এমনকি অচিরেই এই ২৭ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়ে দেন। মানববন্ধনে হেচারি এলাকা ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ভুবনেশ্বর

চাকমার সভাপতিত্বে এবং রাসেল চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য ও এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, রাঙ্গামাটি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কমিশনার রবি মোহন চাকমা এবং গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে দেব মোহন চাকমা, বাবু চাকমা, বিমল কান্তি দেওয়ান, জ্ঞানময় চাকমা প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জুম্মরা বারে বারে উচ্ছেদ হচ্ছে। উন্নয়নের নামে, কখনো মেডিকেল কলেজ, কখনো প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তথাকথিত উন্নয়নের নামে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে অবহেলা, বঞ্চনা ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ না করতে সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, জেলা প্রশাসক যদি জনগণের মনের কথা বুঝতে না পারেন তাহলে তিনি জনসেবক হতে পারেন না। তিনি পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া কথা উল্লেখ করে বলেন- এই চুক্তি এরশাদ সরকার, বিএনপি সরকার ও সর্বশেষ আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত হয়েছে। কাজেই জেলা প্রশাসককে পার্বত্য চুক্তি লংঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ না করতে আহ্বান জানান।

এলাকা ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি ভুবনেশ্বর চাকমা বলেন, "আমাদের সাথে কেন এরকম আচরণ করা হচ্ছে, আমরা কী এদেশের নাগরিক নয়?" তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, যে চুক্তি আপনারা স্বাক্ষর করেছেন, চুক্তির আলোকে যে আইন করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ না করার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ করার অনুরোধ জানান।

৩৯ পৃষ্ঠার পর

রোয়াংছড়িতে এক অপহরণকে কেন্দ্র করে

বিরুদ্ধে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের কর্মী এবং চুক্তি সমর্থনকারী গ্রামবাসীদের রাজনৈতিকভাবে হয়রানি এবং এলাকাছাড়া করার হীনউদ্দেশ্যে এ অপহরণের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এভাবে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যোগসাজশে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক অপহরণের নাটক মঞ্চস্থ করে অপহৃতকে মিয়ারমারে নিরাপদে রাখা হবে এবং অপহরণের সাথে জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গ্রেফতার ও এলাকাছাড়া করা হবে মর্মে এর আগেও অনেক গুজব শোনা গেছে। মংশৈথুই কার্বারীকে অপহরণের মধ্য দিয়েই উক্ত গুজব আজ বাস্তবে রূপ লাভ করেছে বলে বলা যেতে পারে।

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকার জনমতকে বিভ্রান্ত করতে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় অপপ্রচার জোরদার করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করতে তিন পার্বত্য জেলার ক্ষমতাসীন দল, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত জুম্মদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ ধ্বংসকরণ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক অবাধ নিপীড়ন-নির্যাতন ও প্রতিনিয়ত অবৈধ গ্রেফতারের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়া এবং জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হচ্ছে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

কাউখালীতে এক চাকমা ছাত্রী যৌন নিপীড়নের শিকার

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ বেলা ১২:৩০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের রাঙ্গাপানিছড়া এলাকায় এসএসসি পরীক্ষার্থী এক চাকমা ছাত্রী মিনি ট্রাক চালক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এ ঘটনা ওই ছাত্রীর বাবা কাউখালী থানায় যৌন নিপীড়নের অপরাধে মামলা দায়ের করেছে।

জানা যায়, ঘটনা দিন ওই ছাত্রী প্রতিদিনের মতো পোয়াপাড়া মডেল হাইস্কুলে কোচিং শেষ করে তার এক বান্ধবীসহ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। রাঙ্গাপানিছড়া নামক এলাকায় পৌঁছলে পশ্চিম দিক থেকে ইট ভর্তি একটি মিনি ট্রাক এসে রাস্তায় থামে এবং ওই গাড়ির চালক নেমে এসে ওই ছাত্রীকে ডান হাত ধরে টেনে বুকে জড়িয়ে নিয়ে স্তনে হাত দেয়। সে সময়ে ওই ছাত্রী ও তার বান্ধবী চিৎকার করলে ঘটনাস্থলে আশ-পাশের লোকজন ছুটে আসে। এসময়ে মিনি ট্রাক চালক দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পোয়াপাড়ার দিকে চলে যায়। জাহাঙ্গীর নামক এক ব্যক্তি মোটর সাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থলে এলে তাকে বিষয়টি জানানোর পর তিনি মোবাইলে লোকজনকে ঘটনা সম্পর্কে জানান। পরে এলাকাবাসী মিনি ট্রাক চালককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। আটককৃত মিনি ট্রাক চালক চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার খতিব নগর ইসলামপুর গ্রামের মোঃ সামসুল আলমের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন (২৫)। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা কাউখালী থানায় মামলা (মামলা নং-৪, তাং- ৭/১২/২০১৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত/২০০৩)-এর ১০ ধারায়) দায়ের করেছে।

লক্ষ্মীছড়িতে হিন্দু দোকানদার কর্তৃক এক মারমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ শনিবার বিকাল চার ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে হিন্দু মুদিদোকানদার কর্তৃক এক মারমা নারীকে (৩০) ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। ওই মুদিদোকানদার লক্ষ্মীছড়ি বাজারের নিরঞ্জন দাশের ছেলে ধন্য দাশ (৪০)। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে লক্ষ্মীছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছে। ঘটনার পরই পুলিশ ধন্য দাশকে আটক করেছে।

জানা যায়, ঘটনা সময়ে মরমছড়ি গ্রামের ওই নারী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা-কাটার জন্য ধন্য দাশের দোকানে যায়। এ সময়ে দোকানে কোন লোকজন ছিল না। মুদিদোকানদার ওই নারীকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ওই নারী ছাড়া পেয়ে পার্শ্ববর্তী দোকানদারদের ঘটনাটি জানান। পরে বাজারের দোকানদার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান। ঘটনাটি পুলিশকে জানানোর পর পুলিশ এসে ধন্য দাশকে আটক করে। এ ঘটনায় লক্ষ্মীছড়ির ওই নারী বাদী হয়ে লক্ষ্মীছড়ি থানায় ধন্য দাশের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে।

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় এক চাকমা নারী ধর্ষণের শিকার

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় এক চাকমা নারী (৩৫) ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় ওই নারী ধর্ষকদের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি কোতয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত নৌকাচালক ধর্ষককে আটক করা হলেও অপরজন এখনও পলাতক রয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন ওই নারী তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা জন্য দুপুর ১:৩০ ঘটিকার সময় ১২ হাজার টাকা নিয়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজারস্থ শ্যামলী বাস কাউন্টার বসে ছিলেন। এসময়ে সেখানে নিপু ত্রিপুরা এসে কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করেন এবং মোবাইল নম্বরটি দিতে বলেন। পরে এক পর্যায়ে ওই নারীর মোবাইলটি জোরপূর্বক হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার নম্বরে কল করেন। নিপু ত্রিপুরা নিজেকে জেএসএস-এর লোক পরিচয় দেন। ওই নারীর বিরুদ্ধে বাঙালি ছেলেদের সাথে সম্পর্কের অভিযোগ করে বালুখালী জেএসএস অফিসে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় তুলেন। ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি রিজার্ভ বাজার হতে ইসলামপুর যাওয়া পথে দুই কিলোমিটার দক্ষিণে কাপ্তাই হ্রদে পৌঁছলে প্রথমে নিপু ত্রিপুরা ও পরে ইঞ্জিনচালিত নৌকা চালক ওই নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং সাথে থাকা নগদ ১২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় ধর্ষকরা রিজার্ভ রাজারস্থ আল হেলাল আবাসিক হোটেলের মসজিদ সিঁড়ি ঘাটে ওই নারীকে নামিয়ে দিয়ে যায়। এ সময়ে ধর্ষকরা এ ঘটনা কাউকে না বলার জন্য ওই নারীকে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখায়।

এ ঘটনায় ওই নারী গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত সাড়ে আটটায় রাঙ্গামাটি কোতয়ালী থানায় (মামলা নং-১২, তাং- ১৩/১২/২০১৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)-এর ৯(৩), ৩৪ সহ ৩৩৯/৫০৬ পেনাল কোড) মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত ধর্ষক ইঞ্জিনচালককে আটক করা হলেও অপরজন এখনও পলাতক রয়েছে। মামলার আসামী ধর্ষকরা হলো- নিপু ত্রিপুরা (৩২), পিতাঃ লেলু বুচন ত্রিপুরা, মাতাঃ দুবকুলি, গ্রামঃ আব্দুল আলী একাডেমী স্কুলের পেছন, রাঙ্গামাটি, স্থায়ী ঠিকানাঃ কেল্ল্যামুড়া (পলাতক) এবং মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৩), পিতাঃ মোঃ আবু ফয়েজ, মাতাঃ ছগিলা বেগম, গ্রামঃ পুরান পাড়া, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।

রাজপুণ্যাহ মেলায় বেড়াতে এসে এক মারমা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার

একজন যুবলীগ নেতা গ্রেফতার, অন্যরা পলাতক

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত ১০:৩০ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান রাজপুণ্যাহ মেলায় বেড়াতে এসে শহরের শিশু পার্ক এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এসএসসি পরিক্ষার্থী এক মারমা কিশোরী (১৭) গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ওই কিশোরী (১৭) গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ বিকাল সাড়ে তিনটায় রুমা উপজেলা থেকে এক প্রতিবেশীসহ রাজপুণ্যাহ মেলা দেখতে বান্দরবান সদরের মধ্যমপাড়ায় তার এক আত্মীয় বাড়িতে এসেছিল। ঘটনার দিন রাত (২৩ ডিসেম্বর ২০১৬) আনুমানিক ৯:৩০ ঘটিকার সময় তার এক বান্ধবী ও প্রেমিকসহ রাজপুণ্যাহ মেলায় বেড়াতে যায়। পরে তার বান্ধবীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শহরের শিশু পার্ক এলাকায় এলে সেখানে চার সেটেলার বাঙালি যুবক এসে পথরোধ করে এবং তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। এসময়ে সেটেলার বাঙালি যুবকরা ওই কিশোরীর প্রেমিক উফ্যুছাং মারমাকে (২০) ধরে এলোপাতাড়ী মারধর করে আটকে রাখে। পরে জুয়েল ও কাজল (নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকির সময় এ নামটি শুনতে পায়) ওই কিশোরীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চার যুবক পর্যায়ক্রমে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)-এর ৯(৩) ধারায় ওই কিশোরী কাজল ও জুয়েলসহ অজ্ঞাতনামা আরো দু'জনের নামে বান্দরবান সদর থানায় মামলা দায়ের করে। মামলার পর গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত ১:২০ ঘটিকায় বালাঘাটা ইউনিয়নের কেএসপ্রু গ্রাম থেকে সুনীল বড়ুয়ার ছেলে ধর্ষক কাজল বড়ুয়া ওরফে মুন্ডি কাজলকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধর্ষক কাজল বড়ুয়া বান্দরবান পৌর যুবলীগের নেতা বলে জানা যায়।

রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কুপিয়ে জখম

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত ৭:৩০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার সোনাইআগা ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা (২৫) নারীকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার রাতে ওই নারী ঘর থেকে বের হয়ে টয়লেটে যাওয়ার সময় দু'জন মুখোশপড়া সেটেলার বাঙালি এসে ঝাঁপটে ধরে। পরে একজন মুখ চেপে ধরে রাখে এবং অন্যজন ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময়ে ওই গৃহবধু একজনের হাতের আঙ্গুলে কামড় দিলে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ওই নারীর চিৎকার শুনে তার স্বামী এগিয়ে এলে সেটেলার বাঙালিরা ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ওই নারীর বাম হাতে মারাত্মক জখম (হাতের রগ কেটে যায়) হয়। পরে আহত ওই নারীকে রাত ৮:০০ টার দিকে রামগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আহত ওই নারীর বাড়ির পাশের ছড়ায় সেটেলার বাঙালিরা বালু উত্তোলন করে আসছিল। এলাকাবাসীর ধারণা বালু উত্তোলনকারী সেটেলার বাঙালি শ্রমিকরা এ ঘটনা ঘটাতে পারে। এ ঘটনায় এখনও থানায় মামলা হয়নি।

আলীকদমে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এসএসসি পরীক্ষার্থী এক মারমা ছাত্রী ধর্ষিত

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ রাত ৭:৩০ ঘটিকা ও ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ রাত ৭:৪৫ ঘটিকায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদমে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এসএসসি পরীক্ষার্থী এক মারমা ছাত্রী দুইবার ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেলের পশ্চিম পার্শ্বে শিলবুনিয়া ঝিরিতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আলীকদম থানায় মামলা দায়ের করার পর ধর্ষকদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা যায়, ধর্ষণের শিকার ওই ছাত্রী আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগের ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাসে থেকে পড়াশুনা করত। মোঃ মিজানুর রহমান (২৩) ৩/৪ মাস ধরে ওই মারমা ছাত্রীকে বিভিন্নভাবে প্রেমের প্রস্তাবসহ উত্যক্ত করে আসছিল। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ভয়ভীতি দেখিয়ে মোবাইলে ওই ছাত্রীকে গত ১ জানুয়ারি ২০১৭ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০ ঘটিকায় ছাত্রীনিবাসের পাশে শিলবুনিয়া ঝিরিতে ডাকে। পরে ওই ছাত্রী তার এক মারমা বান্ধবী-কে নিয়ে সেখানে গেলে মোঃ মিজানুর রহমান প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে জোরপূর্বক জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়। এ ঘটনার দৃশ্য মোঃ মিজানুর রহমানের বন্ধু মোঃ সাইফুল ইসলাম ওরফে সেলিম মোবাইলে ভিডিও করে। এরপর মোঃ মিজানুর রহমান ওই ছাত্রীকে তার প্রেমের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও লোকজনের কাছে প্রকাশ করার ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেয়।

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ রাত আনুমানিক ৭:৩০ ঘটিকায় এবং ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ রাত আনুমানিক ৭:৪৫ ঘটিকায় মোবাইলে ডেকে নিয়ে মোঃ সাইফুল ইসলাম ওরফে সেলিমের সহায়তায় মোঃ মিজানুর রহমান জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ ধর্ষণের দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও করা হয়। ধর্ষকরা চলে যাবার সময়ে এ ঘটনা কাউকে জানালে ভিডিওটি প্রকাশ করার ভয়ভীতি দেখায়। পরে ওই ছাত্রী এ ঘটনা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানালে তিনি ছাত্রীর অভিভাবকদের জানান। ধর্ষণের শিকার ওই ছাত্রীর বড় ভাই বাদী হয়ে আলীকদম থানায় গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ ধর্ষক সেটেলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১)/ ৩০ এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ এর ৮(১)(২)(৭) ধারায় মামলা দায়ের করে। পরে চৈক্ষ্য ইউনিয়নের আবাসিক বাজার এলাকা থেকে গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ বিকাল ৪:৪৫ ঘটিকায় পুলিশ ধর্ষকদের গ্রেফতার ও ভিডিও করা মোবাইলটি জব্দ করেছে। অভিযুক্ত ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা হল-

১। মোঃ মিজানুর রহমান (২৩), পিতাঃ মোঃ আবুল কালাম, গ্রামঃ পাট্টাখাইয়া (আজিজ কোম্পানীর বিল্ডিং-এর পাশে), চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন, আলীকদম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা;

২। মোঃ সাইফুল ইসলাম ওরফে সেলিম (২৪), পিতাঃ মোঃ সৈয়দ হোসেন, গ্রামঃ বাঘের ঝিরিপাড়াপাট্টাখাইয়া, চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন, আলীকদম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

লামায় তিন বাঙালি যুবক কর্তৃক এক মারমা ছাত্রী অপহরণের শিকার

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার বমু বিলছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হ্লাহ্লা চিং মারমা (১৪) পীং-থুইচাচিং মারমা পার্শ্ববর্তী মাইজপাড়া গ্রামের তিন বাঙালি যুবক কর্তৃক অপহরণের শিকার হয়েছে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ঐদিন রাতে মাইজ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীরের ছেলে সোহেলসহ আরও দুই যুবক অপহৃতের বাসায় এসে লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বমু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্রী হ্লাহ্লা চিং মারমাকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনাটির বিষয়ে লামা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতের পক্ষ থেকে কোন মামলা দায়ের ও অপহৃতদের বিরুদ্ধে কোন আইনী বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

রামগড়ে এক ত্রিপুরা ছাত্রী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রাত ১১ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা সদর ইউনিয়নের রূপাইছড়ি স্কুলপাড়া নামক গ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায়, সেদিন রাত ১১ ঘটিকায় ওই ছাত্রী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হলে আগে থেকে ওৎপেতে থাকা সেটেলার মোঃ হাসান (৩০) পিতাঃ বাচ্চু কোম্পানী, খাগড়াবিল বাজার ও তার বন্ধুরা মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। পরে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় খাগড়াবিল এলাকার জঙ্গল থেকে গ্রামবাসী ওই ছাত্রীকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে রামগড় হাসপাতালে ভর্তি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। ধর্ষণের শিকার ওই ছাত্রী রামগড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা রামগড় থানায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ এখনও ধর্ষককে গ্রেফতার করতে পারেনি।

৫১ পৃষ্ঠার পর

তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি দুইবার ঘেরাও করে এবং বাড়ির জিনিষপত্র তছনছ করে। সর্বশেষ গত ৭ জানুয়ারি ২০১৭ সেনারা অনিল তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রীতি তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি তল্লাসী করে।

রাঙ্গামাটির মগবান এলাকায় সেনাতল্লাশী

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা এলাকার জলপথে স্থানীয় গবঘোনা সেনাক্যাম্পের কম্যান্ডার সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য হঠাৎ তল্লাশী অভিযান শুরু করে। সকাল প্রায় ৭:০০ টার দিকে সেনাসদস্যরা ঐ এলাকায় জলপথে যাতায়াতকারী সকল নৌকা ও বোটের উপর তল্লাশী শুরু করে প্রায় তিন/চার ঘন্টাব্যাপী এই তল্লাশী অভিযান চালায়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকা সত্বেও হঠাৎ এই তল্লাশী অভিযানে জনগণ ব্যাপক হয়রানি বোধ করে বলে জানা গেছে।

১৭ পৃষ্ঠার পর

শাসক মহলের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী

রাজনৈতিক সমাধানকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের নামে এধরনের একতরফা উদ্যোগ পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এবং পার্বত্যবাসীদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না।

উপসংহার

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই পার্বত্য চুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে সামরিক ও নির্বাচিত তিন-তিনটি সরকারের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে মোট ২৬ বার বৈঠক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তবেই বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এই চুক্তির ফলে দীর্ঘ দুই দশকের অধিক সময় ধরে চলা বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতি সরকারের নিকট অস্ত্র জমা দিয়ে জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রত্যাবর্তন করে। পাহাড়ি-বাঙালি বহু মানুষের জীবন, বহু রক্তপাত, অসংখ্য জুম্ম মা-বোনের ইজ্জত, অগণিত জুম্ম নর-নারীর বহুমুখী ও ব্যাপক ভিত্তিক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এই চুক্তি অর্জিত হয়েছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প থাকতে পারে না।

আর চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা আজ জরুরী উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ক্ষমতাসীন দল থেকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের এবং প্রশাসন থেকে সাম্প্রদায়িক, জাত্যভিমানী ও জুম্ম বিরোধী আমলাদের সরাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা ও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। এদের দিয়ে আর যাই হোক সুষম উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কায়েমের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। কাজেই এখন গভীরভাবে ভাবতে হবে, এসমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তি, সংকীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক আমলাদের কারণেই কী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য সমস্যা সমাধানের এই মহতী উদ্যোগ ভেস্তে যাবে? পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব কী বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

ফেসবুকে এক চাকমা যুবকের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার মিথ্যে অপপ্রচার

সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয়ার অভিযোগে এক সেটেলার যুবক আটক গত ২ নভেম্বর ২০১৬ দুপুর সাড়ে ১১:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার সেটেলার মুসলিম পাড়া থেকে এক চাকমা যুবকের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয়ার মিথ্যে অভিযোগে মোঃ সাগর হোসাইন (২৮) নামের এক সেটেলার যুবককে পুলিশ আটক করেছে।

জানা যায়, গত ১ নভেম্বর ২০১৬, দুপুর ১:১৯ টায় সেটেলার মোঃ সাগর হোসাইন একটি বিদেশী অনলাইন পত্রিকার ফটো নিয়ে "আঁধারে দ্বীনের আলো (Sinan)" নামক ফেসবুক গ্রুপে এক চাকমা যুবকের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফ অবমাননার মিথ্যে খবর পোস্ট করে। এরপর ফেসবুকে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করতে শুরু করে। পরে জুম্মরা ফেসবুকে এ মিথ্যা অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ওই ছবিটি সেটেলার মোঃ সাগর হোসাইন যে বিদেশী অনলাইন পত্রিকা থেকে নিয়েছিল সে সংবাদ ও ফটোর লিঙ্ক ফেসবুকে পোস্ট করে এবং এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ ঘটনার পর গত ২ অক্টোবর ২০১৬ বুধবার দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার সেটেলার মুসলিম পাড়া থেকে মোঃ সাগর হোসাইনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আটক মোঃ সাগর হোসাইন সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল হোসেনের ছেলে। আটককৃত ওই সেটেলার যুবকের বিরুদ্ধে মাটিরাঙ্গা থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা (মামলা নং-১) দায়ের করেছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মিথ্যে ধর্মীয় অবমাননার অজুহাতে কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হামলার ঘটনার মতো সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর পরিকল্পনা থাকতে পারে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গ্যা সন্ত্রাসী কর্তৃক তিনজন মারমা অপহৃত, এখনো নিখোঁজ

গত ২৪ নভেম্বর ২০১৬ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের কামিছড়া মাসিবা পাড়া থেকে মংহ্লা চিং মারমা (৪৫), থুইহ্লা মং মারমা (৩২) ও ক্যাচিং থোয়াই মারমা (২২) নামে তিনজন মারমা গ্রামবাসীকে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ করা হয় বলে জানা যায়। জানা যায় যে, ঘটনার শিকার তিনজন সেদিন পাহাড়ি ছড়ায় মাছ ধরতে গেলে আর ফিরে আসেনি। উক্ত এলাকাটি রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবস্থান রয়েছে বলে জানা যায়। উক্ত অপহৃতদের উদ্ধারে বিজিবি ও পুলিশ বাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের নিকট দাবি জানিয়ে তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের হত্যা করে থাকতে পারে বলে এলাকাবাসী ধারণা। এভাবে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এযাবৎ ৮/১০ স্থানীয় জুমচাষী ও জুম্ম গ্রামবাসীদের অপহরণ করে হত্যা করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

নানিয়াচরে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভূমি দখলের চেষ্টা জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট, বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়াচর উপজেলার নানাক্রুম গ্রামের সুভাষ বসু চাকমার মধ্য পুলি পাড়ায় তার নিজ জায়গায় আনারস বাগান করার পর কিছু জায়গা অনাবাদী ছিল। গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল অনুমানিক ৮:০০ ঘটিকায় ওই অনাবাদী জায়গায় বুড়িঘাট হতে ২০/২৫ জন সেটেলার বাঙালি জঙ্গল পরিস্কার করতে আসলে জুম্মরা এতে বাধা দেয়। পরে এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলে সেটেলার বাঙালিরা চলে যায়। কিন্তু ঘন্টা খানেক পরে বুড়িঘাট ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য নিয়ে সেটেলার বাঙালিরা আবার ওই স্থানে হাজির হলে জুম্মরা আতঙ্কে পালিয়ে যায়। এসময়ে সেটেলার বাঙালিরা সুভাষ বসু চাকমা, পহেল চাকমা, টুপন চাকমা, আলোময় চাকমা, শান্তিময় চাকমাসহ সাতজন পাহাড়ির আনারস বাগান কেটে তছনছ করে ও উপরে ফেলে দেয়। মূলতঃ তখনই সেটেলার বাঙালি ও জুম্মদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার পর গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) শাফিউল সারওয়ার বুড়িঘাট ইউনিয়নে গিয়ে সেটেলার বাঙালি ও জুম্মদের সাথে কথা বলেন এবং সুভাষ বসু চাকমার ক্ষতিগ্রস্ত আনারস বাগানের ক্ষতিপূরণ প্রদানের আশ্বাস দেন। এসময় ভূমি কমিশন গঠন হয়েছে, ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়িদের জায়গায় বাঙালিরদের না যাওয়ার জন্য এএসপি পরামর্শ দেন।

এদিকে গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ গভীর রাতে কে বা কারা মধু মিয়া ও জামাল সিদ্দিক-এর আনারস বাগান কেটে ফেলে। ফলে ওই এলাকায় আবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ নানিয়াচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রন বিকাশ চাকমা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারের আশ্বাস দেন। তা সত্ত্বেও গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ মধু মিয়া বাদী হয়ে নানিয়াচর থানায় ২০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

এ মামলাটি দায়েরের সাথে সাথে সেনাবাহিনী যাত্রীবাহী গাড়ি ও পথচারীদের তল্লাসী চালিয়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় তল্লাসী অভিযান চালিয়ে মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেয়। তারই অংশ হিসেবে ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ ঘিলাছড়ি বাজারে যাওয়ার পথে পুলি পাড়ার চারজনকে ঘিলাছড়ি সেনাবাহিনী আটক করে। আটককৃতরা হলো-

১. হ্লাথোয়াই মারমা (৪০), পিতাঃ মৃত রুইঅং মারমা, গ্রামঃ পুলিপাড়া, বুড়িঘাট ইউপি, নানিয়াচর
২. পাইয়ারুই মারমা (৫০), পিতাঃ মৃত পাইচা অং মারমা, গ্রামঃ পুলিপাড়া, বুড়িঘাট ইউপি, নানিয়াচর

৩. মংহ্লা অং মারমা (৫০), পিতা: মৃত সুইথোয়াই মারমা, গ্রাম: পুলিপাড়া, বুড়িঘাট ইউপি, নানিয়াচর

৪. রেনু মারমা (৪০), পিতা: মৃত রুইচাই মারমা, গ্রাম: পুলিপাড়া, বুড়িঘাট ইউপি, নানিয়াচর

এদিকে রাঙ্গামাটি হতে নিজ বাড়িতে যাওয়ার পথে কুতুকছড়ি সেনা সদস্যরা গাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে পাইচাপ্রু রোয়াজা (৪৫) পিতা: থুইঅং রোয়াজাকে আটক করে। পরে তাকে নানিয়াচর সেনা জোনে নিয়ে যায়। ওই দিন রাত আনুমানিক ৯:৩০ ঘটিকার সময় পাইচাপ্রু রোয়াজাকে ছেড়ে দেয়া হলেও বাকী চারজনকে থানায় সোপর্দ করে। পরে গত ২২ ডিসেম্বর আটককৃতরা জামিনে মুক্তি লাভ করে।

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল ৯:০০ ঘটিকার সময় পশ্চিম হাতিমারা এলাকায় পুলিপাড়া গ্রাম থেকে কয়েকজন মারমা তাদের নিজ জায়গায় জঙ্গল পরিস্কার করতে গেলে বুড়িঘাট এলাকার সেটেলার বাঙালিরা বাধা দেয়। এতে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সেটেলার বাঙালি ও জুম্মদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ সময়ে বুড়িঘাট সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য ঘটনাস্থলে পৌছলে জুম্মরা পালিয়ে যায়। পরে সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে পশ্চিম হাতিমারা গ্রামে সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালায়। জানা যায়, এসময়ে সেটেলার বাঙালিরা মালুমচন্দ্র চাকমার ছেলে বৃষকেতু চাকমার বাড়ি থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও একভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায় এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এসময়ে সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালিয়ে পশ্চিম হাতিমারা শান্তি কামী বৌদ্ধ বিহারের বৌদ্ধ মূর্তি ও মাইক ভাংচুর ও আসবাবপত্র তছনছ করে চলে যায়।

এ ঘটনার পর ১৪ ডিসেম্বর সকাল ১০:০০ ঘটিকায় নানিয়ারচর জোনে নানিয়ারচর উপজেলাধীন চারটি ইউনিয়ন ও কুতুকছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের ডাকা হয়। সেখানে পৃথক পৃথকভাবে তাদের সাথে কথা বলার পর অন্যদের ছেড়ে দিলেও বুড়িঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে সারাদিন জোনে রাখা হয় এবং নানাভাবে হয়রানি করা হয়। সেদিন বিকাল ৪:০০ ঘটিকার সময় নানিয়াচর উপজেলাধীন ইউপি চেয়ারম্যানদের নিয়ে নানিয়ারচর সেনা জোনে শক্তিমান চাকমার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে-

১. জুম্মদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার ও আটককৃতদের মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

২. ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালিদের ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা (রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ থেকে ৫০ হাজার, বাকী টাকা নানিয়াচর উপজেলা পরিষদ ও ইউপি থেকে প্রদান করা)।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। সরেজমিন তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

৪. নতুন করে যাতে সমস্যা উদ্ভূত না হয় সেজন্য পাহাড়িদের ভোগদখলীয় জায়গায় বাঙালিরা এবং বাঙালিদের ভোগদলীয় জায়গায় পাহাড়িরা দখল করতে না যাওয়া।

৫. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ সংঘটিত বগাছড়ি-নান্যাচর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলা উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাহার করা।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তবলী গ্রহণ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে নানিয়ারচর সেনা জোন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সিদ্ধান্তবলীতে কেবল প্রথম দু'টি সিদ্ধান্তবলী উল্লেখ করা হয়। পাহাড়িদের সংশ্লিষ্ট শেষোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তবলী সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়। তারপর দিন এ বিষয়টি সেনা জোনের কাছে উত্থাপন করা হলে উক্ত সিদ্ধান্তবলী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয় এবং এক্ষেত্রে তাদের কিছুই করার নেই বলে জানান।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ রাতে কে বা কারা বুড়িঘাট ইউনিয়নের পশ্চিম হাতিমারা গ্রামে মইনুল পিতা মোশারফ নামে জনৈক সেটেলার বাঙালির রোপনকৃত আনারসচারা উপড়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত জায়গাটি দীর্ঘদিন করে হাতিমারা গ্রামের লম চাকমা ভোগদখল করে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় বুড়িঘাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রমোদ খীসাকে বুড়িঘাট ক্যাম্পে ডাকা হয়। তবে রাত হওয়ায় তিনি ক্যাম্পে যেতে পারেননি। তবে বুড়িঘাট ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার অংচাপ্রু মারমা ও পাইচাপ্রু রোয়াজাকে রাত ১০:০০ ঘটিকায় বুড়িঘাট ক্যাম্পে ডেকে নেয়। নানিয়ারচর জোনের টু-আইসি মেজর বাহালুল পিএসসি তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাস করে। তাদের এলাকায় কেন বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটে, জনপ্রতিনিধিরা তাদেরকে অবহিত করে না, এ ধরনের জন্য তারা দায়ী হবেন ইত্যাদি কথা বলে তাদেরকে হুমকি-ধামকি দেয়া হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি বুড়িঘাট ও ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় নানিয়ারচর জোনের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা অভিযান জোরদার করেছে। এতে করে এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরাকে জবাই করে হত্যা

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার লম্বাছড়া গ্রামের কার্তিক চন্দ্র ত্রিপুরা ওরফে কাতিয়া (৬৫) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার ২নং রাবার বাগান এলাকায় বেলা সাড়ে এগার ঘটিকার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পাহাড়ের খাদে মাটিচাপা দেয়া মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধার করে। জানা যায়, হত্যার শিকার কার্তিক চন্দ্র ত্রিপুরা গত ৯ নভেম্বর ২০১৬ বুধবার মাটিরাঙ্গা বাজারের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে কার্তিক চন্দ্র ত্রিপুরাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন সকালে স্বজনরা আবার কার্তিক ত্রিপুরার সন্ধানে গেলে ২নং রাবার বাগান এলাকায় রাস্তার ওপর রক্তের দাগ দেখে সন্দেহ হলে গ্রামের লোকজনকে খবর দিয়ে ওই এলাকায় অনেক খোঁজাখোঁজির পর পাহাড়ের খাদে সদ্য গর্ত খুঁড়ে মাটি ভরাটের চিহ্ন দেখতে পায়। বিষয়টি পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ গর্ত খুঁড়ে কার্তিক চন্দ্র ত্রিপুরার মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধার করে। পরে কিছু দুরে একইভাবে মাটিচাপা দেয়া অবস্থায় গর্ত খুঁড়ে মস্তকটি উদ্ধার করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনরা নিয়ে যায়। এ ঘটনায় মাটিরাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ শুক্রবার দুপুরে পুলিশ হত্যাকারী সেটেলার মো: ওসমান গণিকে পলাশপুর থেকে গ্রেফতার করেছে। খাগড়াছড়ি অতিরিক্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সেটেলার মো: ওসমান গণি (৩৫) হত্যার দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে বলে জানা গেছে। সেটেলার মো: ওসমান গণি গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের বড়পিলাক গ্রামের আবদুল জব্বারের ছেলে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ির ৫ একর রেকর্ডীয় জায়গা দখল

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু ইউনিয়নের অর্ন্তগত লংগদু মৌজায় সুখেশ্বর চাকমা পিতা ধনঞ্জয় চাকমার রেকর্ডীয় ৫ একর পাহাড় ভূমি (হোল্ডিং নং এইচ-১১৩) জবরদখল করে মোঃ ফরহাদ ডাক্তার, পিতা- মৃত ইব্রাহিম বেপারী নামে লংগদুর বাত্যাপাড়ার এক সেটেলার বাঙালি ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। ইদানিং উক্ত অবৈধ দখলদার মোঃ ফরহাদ ডাক্তার নিম্নোক্ত সেটেলার বাঙালিদের কাছে দখলস্বত্ব সাপেক্ষে ষ্ট্যাম্প/বাংলা দলিলের মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে প্রতি শতাংশ ১০/১২ হাজার টাকা হারে উল্লেখিত হোল্ডিং-এর চৌহদ্দিভূক্ত ভূমি বিক্রয় করে থাকে। ভূমি ক্রেতা সেটেলার বাঙালিরা হলো-

১. মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা- হরমুজ আলী, সাং- তিনটিলা পাড়া, লংগদু।
২. মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা- মৃত আব্দুল হেকিম, সাং- বাত্যাপাড়া বটতলা, লংগদু।
৩. মোঃ আব্দুল আজিজ, পিতা- মৃত মোবারক মুন্সি, সাং- বাত্যাপাড়া বটতলা, লংগদু।
৪. ডাঃ বাচা মিয়া (৩৫), বিসমিল্লাহ ফার্মেসী, মাইনীমুখ বাজার, লংগদু।
৫. এ্যাডঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (অভি), পিতা- মোঃ ছানাউল্লাহ, সাং- টিএন্ডটি এলাকা, লংগদু।
৬. মোঃ ওমর ফারুক, প্রধান শিক্ষক, ঝর্ণাটিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লংগদু।

বিষয়টি এলাকার মধ্যে জানাজানি হলে ভূমির মালিক উক্ত ভূমি অবৈধ দখলদারের নিকট থেকে ক্রয় না করার জন্য বাধা প্রদান সত্ত্বেও উক্ত ক্রেতারা ভূমি ক্রয় করে এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বসতবাড়ি নির্মাণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ডিসেম্বর ২০১৬-এর দিকে ভূমির মালিক লংগদু থানায় এর প্রতিকার চেয়ে আবেদন জানালে লংগদু থানা পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে এবং পরবর্তীতে উক্ত ভূমির উপর কোন প্রকার বাড়ি নির্মাণ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, পুলিশের নির্দেশের একদিন আগে মোঃ আঃ রাজাক ২/৩ ঘন্টার মধ্যে ঢেউটিনের ছাউনী ও বেড়া দিয়ে একটি বাড়ি নির্মাণ করে এবং বাড়িটি বর্তমানে স্থিত অবস্থায় রয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে সেটেলার কর্তৃক ৭ জন জুম্ম গ্রামবাসীর ২৫ একর জমি বেদখল

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পাগলী মৌজায় দুইজন সেটেলা বাঙালি কর্তৃক ৭ জন জুম্ম গ্রামবাসীর ২৫ একর জমি জবরদখল করেছে বলে জানা গেছে। জানা যায় যে, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার রত্নাপা-লং ইউনিয়নের চাকবৈঠা গ্রামের অধিবাসী নুরুল কবির চৌধুরী পিতা ফকির আহাম্মদ চৌধুরঅ এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বৈদ্যরছড়া গ্রামের সিরাজ মিয়া পিতা মৃত মোজাহের মিয়া কর্তৃক নিম্নোক্ত ৭ জন জুম্ম গ্রামবাসীর ২৫ একর জমি জবরদখল করে বাগান-বাগিচা গড়ে তুলছে। যাদের জমি বেদখল করা হয়েছে তারা হলেন-

১. মংচ তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা অংচাচিং তঞ্চঙ্গ্যা, সাং হেডম্যান পাড়া;
২. মংবা থোয়াইস তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা মৃত থিংকাঅং তঞ্চঙ্গ্যা, সাং নুনার ছড়া;
৩. পেটান তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা মৃত ঐলাউ তঞ্চঙ্গ্যা, সাং নুনার ছড়া;
৪. নীল পুরী তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা মৃত রিথোয়াইন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং জামীর তলী;
৫. মং চাইন তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা মৃত চৈতাইন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং নুনার ছড়া;
৬. নিমংলা তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা উক্যচিং তঞ্চঙ্গ্যা, সাং হেডম্যান পাড়া;
৭. ক্যচাউ তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা উক্যচিং তঞ্চঙ্গ্যা, সাং হেডম্যান।

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

গুইমারায় সেনাবাহিনী কর্তৃক তল্লাসী অভিযানের নামে নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১:০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলাধীন বরইতলী ও রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া নামে দুইটি গ্রামে এফআইইউ মোঃ রাজ্জাক ও তার এক সহযোগীসহ সিন্দুকছড়ি সেনা জোনের সদস্যরা তল্লাসী অভিযানের নামে নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর ওপর হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে।

জানা গেছে, ঘটনার রাতে তল্লাসী অভিযানের সময় নারী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি ও তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনা সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে যায়। সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক নির্যাতনের শিকার নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীরা হল-

১. মংসাথৈই মারমা (১৮),পিতাঃ উগ্যজাই মারমা, গ্রামঃ বরইতলী, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
২. আথুইপ্রু মারমা (৩২), পিতাঃ আপ্রুসি মারমা, গ্রামঃ বরইতলী, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৩. শান্তি মোহন ত্রিপুরা (২৫), পিতাঃ মানিক চন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৪. চন্দিরাম ত্রিপুরা (২৭), পিতাঃ পপিন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৫. মনজয় ত্রিপুরা (২৬), পিতাঃ সুনাটি ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৬. হ্লাম্রাসাং মারমা (৩০), স্বামীঃ আথুইপ্রু মারমা, গ্রামঃ বরইতলী,গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৭. জরিনা ত্রিপুরা (২২), স্বামীঃ শান্তি মোহন ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৮. প্রীতি বালা ত্রিপুরা (২৪), স্বামীঃ চন্দিরাম ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি
৯. জরেন মালা ত্রিপুরা (২৪), স্বামীঃ মনজয় ত্রিপুরা, গ্রামঃ রাজেন্দ্র মেম্বার পাড়া, গুইমারা, খাগড়াছড়ি

গুইমারায় সেনাবাহিনী কর্তৃক এক নিরীহ মারমা কৃষক শারীরিক নির্যাতনের শিকার

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ সোমবার রাত তিনটায় খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার পথাছড়া গ্রামে নিরীহ এক মারমা কৃষক সেনাবাহিনীর হাতে শারীরিক নির্যাতনে শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঘটনা সময়ে সেনাবাহিনীর সিন্দুকছড়ি সাবজোনের একটি টহল দল গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের পথাছড়া গ্রামে গিয়ে অগ্যজাই মারমা ছেলে নেনো মারমা (৩৮) বাড়ি ঘেরাও

একটি টহল দল গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের পথাছড়া গ্রামে গিয়ে অগ্যজাই মারমা ছেলে নেনো মারমা (৩৮) বাড়ি ঘেরাও
করে অস্ত্র খোঁজার নামে তল্লাসী চালায়। পরে সেনা সদস্যরা নেনো মারমাকে ঘরের ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে উঠানে নিয়ে চোখ ও হাত পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে পানি ঢালে। এ সময়ে সেনা সদস্যরা অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। নেনো মারমা (৩৮) সেনা সদস্যদের জানায়, সে একজন কৃষক; তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। তবুও সেনা সদস্যরা নেনো মারমাকে গাছের লাঠি দিয়ে মারধর করে মারাত্মক আহত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। সকালে চলে যাবার সময় ১৫ দিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের (সিন্দুকছড়ি সাবজোন) কাছে অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে আবার এসে মারধর করার হুমকি দেয়। গ্রামবাসীর জানিয়েছে, সেনা সদস্যদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার নেনো মারমা একজন নিরীহ কৃষক। এ ঘটনায় গ্রামবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন জুম্মকে এক সপ্তাহ ব্যাপী ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্যাতন

গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ দুপুর আনুমানিক ১২:১৫ টায় বান্দরবান সেনা জোনের সাদা পোশাক পরিহিত ৬ জনের একদল সেনা সদস্য রোয়াংছড়ি বাস স্টেশন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির প্রাক্তন এক কর্মী তাইম্রংছড়া গ্রামের সুন্দরলাল তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে আপন্দ তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে পরানকে (২৪) বান্দরবান সেনা জোনে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে এক সপ্তাহ আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটি আপন তঞ্চঙ্গ্যাকে এভাবে সেনা হেফাজতে আটক রাখা ও নির্যাতন চালানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং বিনাবিচারে ও বেআইনীভাবে আটক রাখার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

থানছিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ জুম্মদের ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্যাতন

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ আলীকদম সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য থানছি উপজেলার বলীপাড়ার ইউনিয়নের অনিল চেয়ারম্যান পাড়ার নারায়ণ চাকমার ছেলে নিরীহ গ্রামবাসী চায়ের দোকানদার মিলন চাকমাকে (৩৫) ভোর রাত ৩:০০ টায় তার নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বান্দরবান সেনা ব্রিগেডের কাছে হস্তান্তর করে। সেই ব্রিগেডে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মিলন চাকমাকে ব্যাপক মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। পরে ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ ভোর রাত ৪:০০ টার দিকে সেনাবাহিনী মিলন চাকমাকে তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী স্থানে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা স্বাক্ষরিত এক প্রেসবার্তায় মিলন চাকমাকেও বিনা বিচারে আটক রাখা ও নির্যাতন করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটি অবিলম্বে সেনাবাহিনী কর্তৃক এধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করার দাবি জানান এবং অবিলম্বে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' বন্ধসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি করেন।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনীর আটক ও হয়রানির শিকার জেএসএস'র এক সদস্য ও এক গ্রামবাসী

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল প্রায় ৭:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে তক্তানালা সেনাক্যাম্পের জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য জনসংহতি সমিতির ফারুয়া ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবিন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) ও তক্তানালা দক্ষিণ পাড়ার গ্রামবাসী আদর তঞ্চঙ্গ্যা (৩৩)-কে তাদের নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। আটকের পর সেনাবাহিনী তাদেরকে প্রথমে তক্তানালা সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে সারাদিন আটক রাখার পর সন্ধ্যা প্রায় ৭:০০ টার দিকে সেনাসদস্যরা আটককৃতদের হাত বাঁধা অবস্থায় বিলাইছড়ি উপজেলা সদরস্থ দীঘলছড়ি সেনা জোনে নিয়ে আসে। দীঘলছড়ি সেনা জোনে পৌছার সাথে সাথে সেনাসদস্যরা আটককৃতদের চোখও বেঁধে দেয়। এরপর সেনাসদস্যরা রবিন তঞ্চঙ্গ্যা ও আদর তঞ্চঙ্গ্যাকে তারা ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা (৪০)-কে মারধর করার বিষয়ে জানে কিনা জিজ্ঞেস করে। রবিন তঞ্চঙ্গ্যা ও আদর তঞ্চঙ্গ্যা তারা জানে না বলে জানায়। এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানির মধ্য দিয়ে আটক রাখার পর ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত ১২:০০ টার দিকে দীঘলছড়ি জোন থেকে রবিন তঞ্চঙ্গ্যা ও আদর তঞ্চঙ্গ্যাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ব্যক্তিগত কার্ড তৈরির জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতিকে চিঠি প্রেরণ

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ জোন অধিনায়কের পক্ষে উপ পরিচালক (এমও) অরিজিত কুন্ডু কর্তৃক সদর দপ্তর বরকল জোন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তথ্য চেয়ে জনসংহতি সমিতিকে এক চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।

'ব্যক্তিগত কার্ড প্রস্তুত করণ প্রসংগে' লেখা ওই চিঠিতে সদর দপ্তর রাঙ্গামাটি রিজিয়নের রাঙ্গামাটি সেনানিবাস পত্র নং ২৩.০১.৯৩১.১৩৬.০১.১৪৮.০১.১৮.১২.১৬ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ (সকলকে নহে) এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে- "জোনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ও আঞ্চলিক দলসমূহের ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত কার্ড সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে রাঙ্গামাটি সেনানিবাসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।" পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে-"বরকল উপজেলায় অবস্থিত জেএসএস (মূল) দলের ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত কার্ড তৈরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলকে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।" ব্যক্তিগত কার্ড নামে পাঠানো ছবিযুক্ত ওই নমুনা ফরমে- সদস্যের নাম, ডাক নাম, বয়স, পুরুষ/মহিলা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, উচ্চতা, বুকের মাপ, চোখ, মুখমন্ডল, বর্ণনা, সনাক্তকরণ চিহ্ন, সম্প্রদায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বিবাহিত অবস্থা, স্বামী/ স্ত্রী, ছেলে কতজন মেয়ে কতজন, উত্তরাধিকারী, বন্ধু-বান্ধব, সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে চাওয়া হয়েছে। অন্যান্য জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এ ধরনের কোন তথ্য চাওয়া হয়নি। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর তথ্য সংগ্রহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তাদের নজরদারি করা ও হয়রানি করা।

রোয়াংছড়ি সাব-জোনের সেনা কর্তৃক তিন গ্রামবাসীর বাড়ি তল্লাসী গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ রাত ৩.০০ ঘটিকার সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলা রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে ওয়াগই পাড়ায় তিন নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়ি রোয়াংছড়ি সেনা সাব-জোন থেকে একদল সেনাবাহিনী তল্লাশি চালায়। উক্ত পাড়ায় প্রথমে আকাশময় তঞ্চঙ্গ্যা বাড়িতে গিয়ে দরজার খুলতে বলেন। সে সময় বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকা রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার্থী পুতিমালা তঞ্চঙ্গ্যাকে 'আমরা থানার লোক থানা থেকে আসছি' বলে দরজার খুলতে বাধ্য করেন। তখন সেই কিশোরীর একা অবস্থায়ও দরজার খুলতে বাধ্য হয়। তার পুরো বাড়ী ২/৩ বার ঢুকে তল্লাশী চালায়। এরপর নিরলাল তঞ্চঙ্গ্যা ও অনিল তঞ্চঙ্গ্যা, উভয়ের পিতা-বিমল তঞ্চঙ্গ্যা (কার্বারী) এর বাড়িতে ঢুকে তল্লাশী চালায় ও মধ্য রাতে ঘরে থাকা লোকজনকে হয়রানি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী দলের সদস্যরা সাদা মাহিন্দ্র গাড়িতে লাল কাপড় টাঙিয়ে উক্ত পাড়াতে প্রবেশ করেন। তারপর তল্লাশি ও হয়রানি শেষে ভোর ৫.০০ ঘটিকার সময় পুনরায় লাল কাপড় টানানো অবস্থায় চলে যায়। বর্তমানে ওয়াগই পাড়া প্রতিনিয়ত অভিযানের নামে হয়রানি করে থাকেন। এতে পাড়াবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক পিসিপি'র উপজেলা সভাপতিকে আটক ও হয়রানি

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ বিকাল ৪:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলা সদরস্থ সেনাবাহিনীর ১৩ বেঙ্গলের দীঘলছড়ি সেনা জোনের হাবিলদার জাকির এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা (২৭)-কে দীঘলছড়ি খেলার মাঠে খেলারত অবস্থা থেকে আটক করে দীঘলছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যায়। সেদিন সেনাসদস্যরা মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যাকে সারা রাত জোনে আটকে রেখে মানসিকভাবে নির্যাতন চালায়, বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখায় এবং 'তিনি (মিলন) চাঁদা সংগ্রহ করে কিনা, কে কে চাঁদা সংগ্রহ করে' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তুলে হয়রানি করে। পরদিন সকাল ৬:০০ টায় সেনাসদস্যরা জোর করে 'ভবিষ্যতে

পিসিপি'র কাজ করবে না' বলে লিখিত অঙ্গীকারনামা নিয়ে মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যাকে জোন থেকে ছেড়ে দেয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক অটোরিক্সা ড্রাইভারদের বেদম মারধর

গত ২ জানুয়ারি ২০১৭ সকাল ১১:০০ ঘটিকার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার ডাকবাংলো এলাকায় ইসলামপুর সেনা ক্যাম্পের জনৈক সুবেদার কর্তৃক নিম্নোক্ত চারজন অটোরিক্সা ড্রাইভারকে বেদম মারধর করে বলে জানা যায়। মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন-

১. ইটন তালুকদার (৩০) পিতা নিরোধ বিকাশ চাকমা, সাং তরুনী পাড়া, নানিয়ারচর।

২. জ্ঞান বিকাশ চাকমা (৩২) পিতা ননারাম চাকমা, সুরিদাস পাড়া, নানিয়ারচর।

৩. উত্তম চাকমা (৩১) পিতা অজ্ঞাত, সাং মানেকছড়ি।

৪. শান্তি চাকমা (২৭) পিতা ভরতধন চাকমা, সাং জুরাছড়ি, ঘিলাছড়ি, নানিয়ারচর।

৫. মামুন (৩৫)।

জানা যায় যে, এসময় উক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে তাস খেলা খেলছিলেন। ইসলামপুর সেনা ক্যাম্পের জনৈক সুবেদার হঠাৎ সেখানে গিয়ে কোন অজুহাত ছাড়াই তাদেরকে বেদম মারধর করে।

রুমায় বিজিবি কর্তৃক এক গ্রাম কার্বারীকে দু'দিন ক্যাম্পে আটক

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় বান্দরবানের রুমা উপজেলাধীন সেপ্রু মৌজার কলাই পাড়া কার্বারী ঙায়য়ান ম্রোকে বলিপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের ৭ সদস্য এসে নিজ বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায়।

জানা যায়, ওই গ্রামের জনৈক এক ব্যক্তির বাড়ির উঠানে একটি ওয়াকিটকি সেট পাওয়া যায়। তিনি সেই ওয়াকিটকি সেটটি বলিপাড়া বিজিবি ক্যাম্পে জমা দিতে গেলে সেখানে তাকে জিজ্ঞাসা করে তার বাড়িতে কে কে এসেছিল। সেই ঘটনা সূত্র ধরে রুমা উপজেলার সেপ্রু মৌজার কলাই পাড়া কার্বারী ঙায়য়ান ম্রোকে বিজিবি ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে অবৈধভাবে দুইদিন আটকে রেখে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

অবৈধভাবে ৩০০০ একর জমি বন্দোবস্তী প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

গত ৩ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাসজমি-২ শাখা থেকে উপসচিব শোয়াইব আহমাদ খান স্বাক্ষরিত এক আদেশে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলার ৩৯০ নং কালাপাকুজ্যা মৌজার ৩০০০ (তিন হাজার) একর খাসজমি 'অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫' এর ১১.০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণ পূর্বক খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন ও সরকারি নির্দেশাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের প্রেরিত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের এক পত্র মূলে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত নির্দেশ প্রদান করা হয় বলে জানা যায়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশনামা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত) এর সাথে বিরোধাত্মক ও অবৈধ। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পাশ কাটিয়ে কালাপাকুজ্যা মৌজায় বসতিকারী সেটেলার বাঙালিদের বসতি সম্প্রসারণের হীন উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এই নির্দেশনা দেয়া হয়।

লামায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জনৈক নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন গজালিয়া ইউনিয়নের কোলাকক্যা পাড়া থেকে কুসুম বিকাশ চাকমা (৫৫) নামে জনৈক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করেছে বলে জানা যায়। অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানির পর বিকালে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

বাঘামারা ক্যাম্পের সেনা কর্তৃক ভাড়ায় চালিত সিএনজি ড্রাইভারসহ দুইজন আটক

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ দুপুর ২:০০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন বাঘমারা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার ফারুকের নেতৃত্বে ক্যাম্পের সেনারা ভাড়া চালিত সিএনজি ড্রাইভার নোয়াপতং ইউনিয়নের কানাইজো পাড়ার বাসিন্দা অংসিং মারমা (২৬) পিতা শৈমং মারমা, সাং এবং রাজভিলা ইউনিয়নের খামাদং পাড়ার অধিবাসী নুক্যমং মারমা (২০) পিতা উসাথোয়াই মারমাকে রোয়াংছড়ির বাঘমারা বাজারের অজিত মেম্বারের (বড়ুয়া) চা দোকান থেকে আটক করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানির পর বিকালে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

অপরদিকে বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতি ইউনিয়নে রিতু চাকমা নামে জনৈক নিরীহ ব্যক্তিকে সাদা পোষাকধারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আটক করে বলে জানা যায়।

রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের সেনা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যকে আটক

গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের সেনা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহ-তি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অনিল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং বিমল তঞ্চঙ্গ্যা (কার্বারী)-কে ওয়াগই পাড়ার প্রকাশ স্টোর (বড়ুয়া) থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে বান্দরবান জোনে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন থানায় মামলা ছিল না। এছাড়া অনিল তঞ্চঙ্গ্যার স্ত্রী ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যাকে সেনা সদস্যরা ধাক্কা দিয়ে আহত করে। আহত অবস্থায় তাঁকে রোয়াংছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, এর আগে রোয়াংছড়ি ক্যাম্পের সেনারা অনিল

৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সংগঠন সংবাদ

কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজের নবীনবরণ ও কলেজ শাখা পিসিপির কাউন্সিল

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ শাখার উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর ২০১৬ কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজের জুম্ম শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ও পিসিপির কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা। আরো উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে জুম্ম শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজ-রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। তাই জুম্ম শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি জুম্ম জাতীয় জীবনে এক একজন বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

রাজশাহীতে এম এন লারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও এম এন লারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। টুর্নামেন্টটিতে মোট ৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল খেলায় আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, আসারু সিনিওর একাদশকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। টুর্নমেন্টটি ১লা নভেম্বর শুরু হয়ে ৯ নভেম্বর ২০১৬ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপেন চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি মনি শংকর চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা বিভাগের পরিচালক চৌধুরী মুনিরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা বিভাগের সিনিয়র উপ-পরিচালক আছাদুজ্জামান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হেমন্ত মাহাতো ।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে পাহাড়ি এবং সমতলের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার মানসিকতার বিকাশ লাভ করবে। বক্তব্যে তিনি আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া বাজেটে পিসিপি কর্তৃক এম এন লারমা টুর্নামেন্ট এবং অন্যান্য খেলাধুলা আয়োজনের জন্য বাজেট প্রস্তাব করবেন বলে আশ্বাস দেন।

নান্যোচর গণহত্যা স্মরণে পিসিপির বিভিন্ন শাখার আলোচনা সভা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ ও দোষীদের বিচার করুন

১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নানিয়াচরে সেটেলার ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নিরীহ জুম্মদের উপর ঘটে যাওয়া গণহত্যার স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিতে গত ১৭ নভেম্বর ২০১৬ "নান্যাচর বর্বরতম গণহত্যা" শীর্ষক আলোচনা সভা অয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর রাঙ্গামাটির নান্যেচর উপজেলার সদর বাজারে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে জুম্মদের উপর সেনা-সেটেলার বাঙালি-লদের উদ্যোগে সংঘবদ্ধ গণহত্যা চালানো হয়। হত্যাযজ্ঞে নিহত হন অনেক নিরীহ জুম্ম, আহত হন শতাধিক জুম্ম। বর্বর এই হত্যাকান্ডের হোতাদের শাস্তি দূরের কথা, ঘটনাটিকেই ধামাচাপা দিতে চেয়েছে শাসকশ্রেণি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার দপ্তর সভাপতি মনিশংকর চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম। সম্পাদক অরুণ চাকমার সঞ্চালনায় সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি রাজশাহী মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক সুপন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক দীপেন চাকমা, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক নুকুল পাহান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক রাসেল চাকমা, সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রিয়দর্শী চাকমা।

বক্তারা বলেন, সরকার আমাদের পক্ষে কখনো ছিলো না এবং আজও নেই। সুতরাং আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে এবং সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে। আলোচনা সভা শেষ করে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে রাবির কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া থেকে শহীদ মিনারে অর্পণ করা হয়। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন শেষে গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

রাঙ্গামাটি : পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি অন্তিক চাকমা প্রমুখ।

চট্টগ্রাম : ১৭ই নভেম্বর, ২০১৬ সংঘটিত নান্যেচর গণহত্যা দিবসে পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং চট্টগ্রাম মহানগরে পৃথক পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পিসিপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়ার সঞ্চালনায় এবং রিময় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা। সভার শুরুতে নান্যেচর গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চবি শাখার পিসিপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক মনস্বী চাকমা। আরো বক্তব্য রাখেন চবি পিসিপি'র ২নং গেইট শাখার সহ-সভাপতি কৃতি চাকমা, বিএমএসসি সহ-সাধারণ সম্পাদক মংকিথোয়াই মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ফোরামের প্রতিনিধি জনক তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে গুণবান চাকমা, মংসিং মারমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মিঠুল চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ধ্রুব জ্যোতি চাকমা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম চাকমা।

চট্টগ্রাম মহানগরের আলোচনা সভায়ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা। সভার শুরুতে নান্যেচরের গণহত্যায় শহীদ হওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি পিপলস মারমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার সাধারণ সম্পাদক ভুবন তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার সভাপতি সুমেন্টু চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমা এবং পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাচ্চু চাকমা বলেন, চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের দ্বারা ডজন খানেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে নান্যেচর গণহত্যা এক অন্যতম বর্বর ও নৃশংস। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধী দলের সাথে সংলাপ এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন কে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে এ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস নিপীড়ন-নির্যাতনের ইতিহাস, শোষণ-বঞ্চণার ইতিহাস। সেই ইতিহাস বর্তমান তরুণ সমাজকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। কারণ ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাসের আলোকে আজকে যুব ও ছাত্র সমাজের দর্শন কেমন হওয়া প্রয়োজন সেটা ভাবতে হবে। যুগে যুগে প্রতিটি পরিবর্তনে ছাত্র-যুব সমাজের গৌরবোজ্জল ত্যাগের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা এই জুম্ম নব প্রজন্মকেও পালন করতে হবে।

উক্ত সভার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটপাট সহ সমস্ত মানবাধিকার লংঘনকারী ঘটনার যথাযথ বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হয়।

পিসিপি কাপ্তাই সুইডিশ শাখার ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন

"অজস্র তারুণ্যের মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় বাহুতে, তেজের প্রত্যয়ে মুক্তি ঘটুক জুম্ম জাতিতে"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই সুইডিশ শাখার ৩য় কাউন্সিল গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ চিৎমরম ইউনিয়ন পরিষদ হলে সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি অন্তিক চাকমা, পিসিপির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, পিসিপি কর্ণফুলী ডিগ্রি কলেজ শাখার সভাপতি অংছিনু মারমা এবং সভাপতিত্ব করেন পিসিপির কাপ্তাই সুইডিশ শাখার সভাপতি পূর্ণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। জ্ঞান নয়ন চাকমার স্বাগত বক্তব্যর মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। পরে পূর্ণবিকাশ তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, রিপন তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং ডলেন্দ্র ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি কাপ্তাই সুইডিশ শাখা কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা মাইকেল চাকমা।

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন কলেজ শাখায় পিসিপির কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৬ নভেম্বর ২০১৬ পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে "ঐক্যবদ্ধ শৃংখলা, মানবতার আদর্শে দৃপ্ত শপথ, চলো মুক্তি ছিনিয়ে আনি ভেঙে সব সংকট"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি বিএম ইনস্টিটিউট এর ৭ম, রাঙ্গামাটি লেকার্স কলেজ শাখা ২য় এবং রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ শাখার ২য় বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০১৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পুলক চাকমা সহ বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক বিনয় সাধন চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অন্তর চাকমার স্বাগত বক্তব্যর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সভায় প্রধান অতিথি বাচ্চু চাকমা বলেন, রাঙ্গামাটির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রগামী ছাত্রদের অংশগ্রহণে পিসিপির পথচলা আগামীতে নিশ্চয়ই দুর্বার হয়ে উঠবে।

পরবর্তীতে প্রত্যেক শাখায় ১৭ সদস্য বিশিষ্ট করে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে অধিরাম চাকমা।

কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা
রাঙ্গামাটিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ, তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান, মামলার পুন:তদন্তের দাবি

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সকাল ১০ টায় রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় প্রধান ফটকের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় সহ তথ্য প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, এড. সুস্মিতা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টু মনি তালুকদার, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা।

মানববন্ধনে বক্তরা বলেন, ১৯৯৬ সালের ১১ জুন গভীর রাতে কল্পনা চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। এই ঘটনার সাথে লে. ফেরদৌস, ভিডিপি কমান্ডার মোঃ নুরুল হক, মোঃ সালেহ আহমদ জড়িত। কিন্তু অপহরণের ২০ বছর অতিক্রান্ত হলেও তদন্ত কর্মকর্তারা বার বার চিহ্নিত অপরাধীদের নাম বাদ দিয়ে মনগড়া তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বক্তারা তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

নবীন বরণ ও পিসিপি চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

"ডাকছে ভূমি, ডাকছে পাহাড়, শোনরে নবীন প্রাণ, ভাসাও এবার রণের তরী, গাও যৌবনের গান"- এই শ্লোগানকে সাথে নিয়ে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ চট্টগ্রামের থিয়েটার হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখা কর্তৃক চিটাগাং ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজিতে ভর্তি হওয়া আদিবাসী নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ এবং পিসিপির চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সকালের অধিবেশনে নবীন বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি শরৎজ্যোতি চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রিতিশ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি বাবলু চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার সভাপতি সুমেন্টু চাকমা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই নবীন বরণ শুধু নবীন বরণ নয়, এই নবীন বরণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পড়তে আসা জুম্ম ছাত্র সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধকে আরো শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে করুণ বাস্তবতা, সেটা এই নব প্রজন্মকে অনুধাবন করতে হবে। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়া যায় না, তার জন্য প্রয়োজন নিজের মনুষ্যত্ববোধ, মানবতাবোধকে জাগ্রত করা। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, তাই এই জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সেই শিক্ষা হতে হবে যথয়যথ এবং পরিপূর্ণ।

বক্তারা আরো বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একটি আর্দশের নাম। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একটি সংগ্রামের নাম। অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদ করতে গিয়েই এই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জন্ম। ষাট-সত্তর দশকে ছাত্র সমাজ যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, ঠিক সেইভাবে আজকের ছাত্র সমাজকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাদের গুরু দায়িত্বের ভার কাঁধে নিয়ে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নানা কুচক্রী মহল, সুবিধাবাদী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সংগ্রামকে ব্যাহত করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা আজকের ছাত্র সমাজকে অনুধাবন করতে হবে। সমাজের অর্ধাঙ্গী হচ্ছে নারী সমাজ, সেই নারী সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা কল্পনা চাকমাকে হারিয়েছি, কিন্তু তার আদর্শ হারাইনি। আমরা চাই এই জুম্ম নারী সমাজ থেকেই হাজারো কল্পনা উঠে আসুক।

দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলে অন্যদিকে চুক্তি পরিপন্থী বিভিন্ন কাজ করে চলেছে, সেটা এই তরুণ প্রজন্মকে বুঝতে হবে। তাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান ছাত্র সমাজকে তাদের মুক্তির পথকেই বেছে নিতে হবে। যদি সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তাহলে জুম্ম জনগণ বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য এবং সেখানে অবশ্যই ছাত্র সমাজকে অগ্রগামী হিসেবে থাকতে হবে। এছাড়াও বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঘোষিত দশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে পিসিপির চট্টগ্রাম প্যারানেডিকেল ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি শরৎজ্যোতি চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছাত্রনেতা বাচ্চু চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অর্থ সম্পাদক মিন্টু চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক ছাত্র এডভোকেট লেনিন মারমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অনিল বিকাশ চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা। সুরেশ চকমার

সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সভাপতি মিটুল চাকমা (বিশাল)। কাউন্সিলে পিসিপি পলিটেকনিক শাখায় হিতোষ চাকমাকে সভাপতি, সুরেশ চকমাকে সাধারণ সম্পাদক,উত্তম চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি এবং প্যারামেডিকেল শাখায় জুনি চাকমাকে সভাপতি, শুভ্র চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মংসাই মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

উক্ত নবনির্বাচিত কমিটিদ্বয়কে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিতিশ চাকমা। সম্মেলন শেষে চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট এ অধ্যায়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের এক যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে ঊষাতন তালুকদার এমপি

পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম বন্দরস্থ পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের এক যুগপূর্তি উপলক্ষে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ র‍্যালি, সমাবেশ, কাউন্সিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগ্রামের এক যুগ পূর্তি অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব জিয়াউল হক সুমন। পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাংসদ ঊষাতন তালুকদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য

রাখেন চট্টগ্রাম-১১ আসনের সংসদ সদস্য এম এ লতিফ-এর প্রতিনিধি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ চট্টগ্রাম মহনগরের উপদেষ্টা মন্ডলী সদস্য জনাব শেখ মো. ইছহাক মিয়া, ব্যারিস্টার কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এহতেশামুল হক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক মংথেন্‌হ্লা রাখাইন, ব্যারিস্টার কলেজ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইব্রাহিম খলিল বাদশা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি পূর্ণ বিকাশ চাকমা, শান্তি রানী চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক দিশান তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, রাঙ্গামাটির সংসদ সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, শহরে বাস করতে হলে অনেক খরচ লাগে। তাই মালিক পক্ষ যাতে শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান করে তার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য তিনি জাতীয় সংসদে কথা বলবেন। তিনি পাহাড়ি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধু খেতে না পাওয়ার কারণে আপনারা এখানে এসেছেন তা নয় পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান সমস্যার কারণে আপনাদের এখানে আসতে হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন হয়েছে কিন্তু এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয় যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, পার্বত্য জেলা পরিষদ ক্ষমতায়ন কোন-টিই করা হয়নি।

উদ্বোধক জিয়াউল হক সুমন বলেন, আমি দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ি শ্রমিকদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামীতেও আমাদের মধ্যে এই সম্পর্ক বজায় থাকবে। ব্যারিস্টার কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এহতেশামুল হক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ তাদের অধিকার আদায় করেই নেবে। তারা সংগ্রাম করছে। তিনি আশা করেন সরকার চুক্তি করেছে এবং বাস্তবায়ন ও করবে।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। চুক্তির মৌলিক বিষয় গুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। যত দিন পাহাড়ি মানুষের অস্তিত্ব থাকবে তত দিন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম চলতে থাকবে।

বক্তারা আদিবাসী শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের লড়াই-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। সভা শেষে সুমন চাকমাকে সভাপতি, অনিল বিকাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং দিশান তনচংগ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পিসিপি কাপ্তাই থানা শাখার ১৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'অবিলম্বে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত করণসহ পার্বত্য চুক্তি বস্তবায়নে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হউন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ পুরাতন ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনাতয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাপ্তাই থানা শাখার ১৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি কাপ্তাই থানা কমিটির সভাপতি বিক্রম মারমা ও সহ-সভাপতি

মনুচিং মারমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপা চাকমা। আলোচনা সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। পরে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি কাপ্তাই থানা শাখা গঠন করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপির অর্থ সম্পাদক অন্তিক চাকমা।

পিসিপি টিটিসি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ টিটিসি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রাঙ্গণে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিসিপি টিটিসি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি হৃদয় চাকমার সভাপতিত্বে ও মিকেল চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা ও পিসিপি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুপিয়ন চাকমা। অনুষ্ঠানের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ জনাব সানাউদ্দিন শেখ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রতন চক্রবর্তী ও মো: জাফর খান। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করার আহবান

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ চট্টগ্রামের মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ৭টি থানা শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির সদস্য ফুল কুমার ত্রিপুরা, কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক মংথেনহ্লা রাখাইন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক জুনিয়া ত্রিপুরা, সদস্য রবীন্দ্র ত্রিপুরা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি সুমন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অনিল বিকাশ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক দিশান তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা প্রমুখ।

মোট চারটি অধিবেশনে ভাগ করে দিনব্যাপী সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন চলে। পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের শাখা কমিটির প্রতিনিধি এবং পার্টির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ তথা অধিকারহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ঐসব মানুষের অধিকার এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করে আসছে। সংগ্রামের ফল আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই চুক্তি পাহাড়ি জুম্মদের অধিকারের দলিল। কিন্তু সরকার তা বাস্তবায়ন করছে না। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে যুব সমাজ, শ্রমিক সমাজ ও ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে অধিকার আদায় করে নিতে হবে। তিনি বলেন, সংগ্রাম করতে না পারলে অধিকার আসবে না আর অধিকার না থাকলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। সম্মেলন ও কাউন্সিলের অন্যতম আলোচক সজীব চাকমা বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, শ্রমজীবী মানুষের এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দুনিয়া জুড়ে তরুণ শক্তি মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং জীবনও উৎসর্গ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের জাতিগত অধিকার এবং আত্মপরিচয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলেও চলমান সংগ্রামে তরুণ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আদিবাসী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শ্রমিক শ্রেণির আদর্শকে ধারণ করে শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষকের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যমুলক যে কোন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করতে হবে। সমাজে রাষ্ট্রে অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির মধ্য থেকে নেতৃত্ব যাতে উঠে আসে সেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস রাখতে হবে।

আলোচনা শেষে মিন্টু বিকাশ চাকমাকে সভাপতি, কল্প চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে চান্দঁগাও থানা কমিটি, সুখময় চাকমাকে সভাপতি এবং কিরণ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে পতেঙ্গা থানা কমিটি, জগৎ জ্যোতি চাকমাকে সভাপতি এবং রাসেল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ইপিজেড থানা কমিটি, প্রীতি জীবন চাকমাকে সভাপতি এবং এপোলো চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে পাহাড়তলি থানা কমিটি, নিউটন চাকমাকে সভাপতি এবং তপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে বন্দর থানা কমিটি, টিটু চাকমাকে সভাপতি এবং সুপ্রিয় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে মাইল মাথা ইউনিট কমিটি, বিকাশ চাকমাকে সভাপতি এবং জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ডবলমুরিং থানা কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি কমিটিকে আগামী এক বছরের জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। কমিটিসমুহকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎ জ্যোতি চাকমা।

আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ পাঠ্যবইয়ে 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' শব্দটির পরিবর্তে 'আদিবাসী' শব্দটি চালু করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সকাল ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ গেইট এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগে সকল আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ পাঠ্যবইয়ে 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' শব্দটির পরিবর্তে 'আদিবাসী' শব্দটি চালু করার দাবিতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক শ্রী ত্রিজিনাদ চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিন্টু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি সম্রাট সুর চাকমা।

বক্তারা বলেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষার মাস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহান একুশের চেতনাকে ধারন করে আমরা এদেশে বসবাস করছি। একুশ আমাদের সকল জাতির ভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখায়। এদেশের মানুষ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে যা অত্যন্ত গৌরবের ও সম্মানের। বাংলাদেশ বহু সংস্কৃতির, বহু ভাষার, বহুজাতির বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। এদেশের সন্তানেরা সংগ্রামের মাধ্যমে, জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা ও গুরুত্বকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ পাঠ্য বইয়ে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' শব্দটি বাতিল করে 'আদিবাসী 'শব্দটি চালু করার জোর দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, নতুন পাঠ্য বইয়ে ধর্মীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতার ভূত ঢুকিয়ে দিয়ে কোমলমতি শিশুদের প্রগতিশীল ভিত্তিকে বাঁধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। একজন শিশুকে যদি সর্বপ্রথমে প্রাথমিক স্তরে উত্তরীয় পরিধানের মতো ওড়না শব্দটি শেখানো হয় তাহলে সেটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের মস্তিষ্কে লিঙ্গ বৈষম্য শিক্ষা পাকাপোক্ত করা হবে। এই প্রতিফল সারা বাংলাদেশের মানুষকে একদিন বহন করতে হবে। এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে এদেশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার আস্তানায় পরিণত হতে তেমন সময় লাগবে না।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল, এই অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে তাদের স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জুম্মদের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে ১৪টি জুম্ম জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। দীর্ঘ ২ যুগের অধিক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামের ফলে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আজ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ায় স্ব-স্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আদিবাসীদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ হিসেবে সরকার এ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি ভাষাসহ দেশের মোট পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ৫০ হাজার বই ছাপিয়ে বিলির ব্যবস্থা করেছে বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। পার্বত্য

অঞ্চলে অধিকাংশ স্কুলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষায় বই পায়নি। আর সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, মাতৃভাষায় বই পড়ানোর জন্য সরকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থা করেনি। বই পড়ানোর শিক্ষক শিক্ষিকা যদি নাই থাকে তাহলে বই সরবরাহ করা অর্থহীন হবে বলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মনে করে ।

মানববন্ধনে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়-

১. আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ৫% সংরক্ষিত শিক্ষা কোটা আদিবাসীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।
৩. পাঠ্য পুস্তকে ''ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী'' শব্দটি বাতিল করে ''আদিবাসী'' ব্যাবহার করতে হবে।
৪. আদিবাসীদের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে রাঙ্গামাটি শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯ তম বর্ষপূর্তির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

জীবতলী চেয়ারম্যান পাড়ায় জনসভায় জনসংহতি সমিতির সভাপতি

সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অসত্য বক্তব্য প্রদান করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ “পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ জোরদার করুন”- এই শ্লোগানকে সামনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জীবতলী ইউনিয়ন কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের জীবতলী চেয়ারম্যান পাড়ায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির জীবতলী ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও জীবতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুশীল কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রী লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা, স্বভূমি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ, বহিরাগত অনুপ্রবেশ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে মোটেই আন্তরিক নয় এবং চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কেও অসত্য বক্তব্য প্রদান করে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে এবং তথাকথিত উন্নয়নের নামে সরকার চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। তিনি আরো বলেন, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিশেষে আত্মবলিদানে সংকল্পবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি যুব সমাজ ও এলাকাবাসীদের উদাত্ত আহ্বান জানান।

জনসভার পূর্বে শ্রী লারমা বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়-এর অধীনে নির্মিত জীবতলী চেয়ারম্যান পাড়া ফুটব্রীজ উদ্বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

জাতিসংঘের সংখ্যালঘু ফোরামের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির যোগদান

গত ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সংখ্যালঘু বিষয়ক ফোরামের ৯ম অধিবেশন সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে জাতিসংঘের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের মানিক সরেন, কাপেং ফাউন্ডেশনের ফাল্গুনী ত্রিপুরা ও জহন ত্রিপুরাও উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন বলে জানা যায়। জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বিষয়ক ফোরামের উক্ত অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে মানবিক দুর্যোগের প্রভাব রোধকরণ ও হ্রাসকরণের উপায় হিসেবে সংখ্যালঘু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (৩নং এজেণ্ডা); মানবিক বিপর্যয়ের সময় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষা করা (৪নং এজেণ্ডা) এবং বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ও স্থায়ীত্বশীল সমাধান নিশ্চিতকরণ (৫নং এজেণ্ডা) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ও স্থায়ীত্বশীল সমাধান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত ৫নং এজেণ্ডায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ত্রিজিনাদ চাকমা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিপর্যয় থেকে উত্তরণ এবং স্থায়ীত্বশীল সমাধান নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশের আদিবাসীরা তাদের স্বভূমিতে প্রতিনিয়ত সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো সেরকম একটি অঞ্চল যেখানে বিগত সত্তর দশক থেকে সংঘাত, সামরিকায়ন ও অন্য অঞ্চল থেকে সেখানে জনসংখ্যা স্থানান্তর সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখী হয়ে আসছে। এই সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর সরকারের সাথে আদিবাসী জুম্মদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে সেখানে দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত সংঘাতের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

শ্রী চাকমা তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ, বিশেষ করে বেসামরিকীকরণ, বিশেষ শাসিত অঞ্চলের বিধানাবলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেটেলার বাঙালিদের ফিরিয়ে নেয়া, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পার্বত্য পুলিশ গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে আদিবাসী জুম্মরা এখনো পূর্বের মতো সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে চলছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, আদিবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি, সমঝোতা ও গঠনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত দেখা দেয়। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয় রোধকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করতে তিনি জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বিষয়ক ফোরামসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ করে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত, যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোড-ম্যাপ) ঘোষণা ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা